PART-11

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

আল 'আনকাবূত

২৯

নামকরণ

একচল্লিশ আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে 'আনকাবূত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সে সূরা।

নাযিল হবার সময়-কাল

৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরাতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকন্তু বিষয়বস্তুগুলোর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও একথাই সমর্থন করে। কারণ, পশ্চাতপটে সে যুগের অবস্থার চিত্র ঝলকে উঠতে দেখা যায়। যেহেতু এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকীর প্রকাশ হয় মদীনায়, সেহেতু কোন কোন মুফাস্‌সির ধারণা করে নিয়েছেন যে, সূরাটির প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানী এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মক্কী। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকীর ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদীনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরাত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোন কোন মুফাস্‌সির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন। অথচ মদীনায় হিজরাতের আগে মুসলমানগণ হাবশায়ও হিজরাত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোন হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে যে যুগে মুসলমানদের হাবশায় হিজরাত সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য

সূরাটি পড়লে মনে হবে এটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন মক্কায় মুসলমানরা মহা বিপদ-মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা এবং মু'মিনদের ওপর চালানো হচ্ছিল কঠোর জুলুম-নিপীড়ন। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে সাচ্চা ঈমানদারদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও অবিচলতা সৃষ্টি করার এবং অন্যদিকে দুর্বল ঈমানদারদেরকে লজ্জা দেবার জন্য

এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কার কাফেরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের জন্য এমন পরিণতি ডেকে এনো না সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা প্রতি যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

সে সময় কিছু কিছু যুবক যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এ প্রসংগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন তাঁদের পিতা-মাতারা তাঁদের ওপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ত্যাগ করে তাদের দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তাঁদের পিতা-মাতারা বলতো, যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তাতেও তো একথাই লেখা আছে যে, মা-বাপের হক সবচেয়ে বেশী। কাজেই আমরা যাকিছু বলছি তাই তোমরা মেনে নাও। নয়তো তোমরা নিজেদের ঈমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। ৮ আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন নওমুসলিমকে তাদের গোত্রের লোকেরা বলতো, তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও এবং ঐ ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাও, এ জন্য আযাব-সওয়াব যাই হোক, তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। যদি এ জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন তাহলে আমরা অগ্রবর্তী হয়ে বলে দেবো ঃ জনাব, এ বেচারাদের কোন দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই আমাদের পাকড়াও করুন। এর জবাব দেয়া হয়েছে ১২-১৩ আয়াতে।

এ সূরায় যে কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ দিকটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে দেখো, তাঁরা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কত দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই ভয় পেয়ো না। আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু পরীক্ষার একটি সময়-কাল অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনীগুলোতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হতে দেরী হয়, তাহলে তাতে আর কোনদিন পাকড়াও হবেই না বলে মনে করে নিয়ো না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ তোমাদের সামনে রয়েছে। দেখে নাও, শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ হয়েই গেছে এবং আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে সাহায্য করেছেন।

তারপর মুসলমানদের এভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জুলুম-নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ঈমান পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ আছে সেখানে চলে যাও।

এসব কথার সাথে সাথে কাফেরদেরকে বুঝাবার দিকটিও বাদ দেয়া হয়নি। তাওহীদ ও আখেরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিরককে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছেন এ নিদর্শনাবলী তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣

আলিফ–লাম–মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?[১] অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি[২] আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন[৩] কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

১. যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু'আযযমায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম–নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন–নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি–রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে অনাহারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের কোন ব্যক্তি হতো, তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থা মক্কায় একটি মারাত্মক ভীতি ও আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ কারণে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো এবং কিছু লোক ঈমান আনার পর ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা হয়ে কাফেরদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেনি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন বুখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ তাঁদের গ্রন্থে। তিনি বলেন, যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে–উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মু'মিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ–প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।"

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ্‌ মু'মিনদেরকে বুঝান, ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার চুল্লী অতিক্রম করতে হবেই। তাকে এভাবে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এত সস্তা নয় এবং দুনিয়াতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত আয়াসলব্ধ নয় যে, তোমরা কেবলি মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দান করে দেবো। এসবের জন্য তো পরীক্ষার শর্ত রয়েছে। আমার জন্য কষ্ট বরদাশত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন–নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, বিপদ–মুসীবত ও সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশংকা দিয়েও পরীক্ষা করা হবে এবং লোভ–লালসা দিয়েও। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা ভালোবাসো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তাকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এমন প্রত্যেকটি কষ্ট যা তোমাদের অনভিপ্রেত এবং তোমরা অপছন্দ করে থাকো, আমার জন্য তা অবশ্যই বরদাশ্‌ত করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমাকে মানার যে দাবী করেছিলে তার সত্য–মিথ্যা যাচাই হবে। কুরআন মজীদের এমন প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে বিপদ–মুসীবত ও নিগ্রহ–নিপীড়নের সর্বব্যাপী আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অবস্থা হয়ে গেছে সেখানেই একথা বলা হয়েছে। হিজরাতের পরে মদীনায় মুসলমানদের জীবনের প্রথমাবস্থায় যখন অর্থনৈতিক সংকট, বাইরের বিপদ এবং ইহুদী ও মুনাফিকদের ভিতরের দুষ্কৃতি মু'মিনদেরকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল তখন আল্লাহ বলেনঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

"তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী

(ঈমানদার) গণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ–ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"

(আল বাকারাহ, ২১৪)

অনুরূপভাবে ওহোদ যুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের ওপর আবার বিপদ–মুসীবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয় :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" (আলে ইমরান, ১৪২)

প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মনে এ সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়। ভেজাল নিজে নিজেই আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং নির্ভেজালকে বাছাই করে নিয়ে নেয়া হয়। এভাবে সে আল্লাহ্‌র এমনসব পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়, যেগুলো কেবলমাত্র সাচ্চা ঈমানদারদের জন্যই নির্ধারিত।

২. অর্থাৎ তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে?

৩. মূল শব্দ হচ্ছে فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন" একথায় কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ্ তো সত্যবাদীর সত্যবাদিতা এবং মিথ্যুকের মিথ্যাচার ভালোই জানেন, পরীক্ষা করে আবার তা জানার প্রয়োজন কেন? এর জবাব হচ্ছে, যতক্ষণ এক ব্যক্তির মধ্যে কোন জিনিসের কেবলমাত্র যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাই থাকে, কার্যত তার প্রকাশ হয় না ততক্ষণ ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে সে কোন পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে এবং অন্যজনের মধ্যে যোগ্যতা আছে আত্মসাত করার। এরা দু'জন যতক্ষণ না পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং একজনের থেকে আমানতদারী এবং অন্যজনের থেকে আত্মসাতের কার্যত প্রকাশ না ঘটে ততক্ষণ নিছক নিজের অদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ একজনকে আমানতদারীর পুরস্কার দিয়ে দেবেন এবং অন্যজনকে আত্মসাতের শাস্তি দিয়ে দেবেন, এটা তাঁর ইনসাফের বিরোধী। তাই মানুষের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ করার আগে তাদের কর্মযোগ্যতা ও ভবিষ্যত কর্মনীতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র যে পূর্ব

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

আর যারা খারাপ কাজ করছে[৪] তারা কি মনে করে বসেছে তারা আমার থেকে এগিয়ে চলে যাবে?[৫] বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা করছে।

যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আশা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই।[৬] আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৭] যে ব্যক্তিই প্রচেষ্টা–সংগ্রাম করবে সে নিজের ভালোর জন্যই করবে।[৮] আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষিতাহীন।[৯]

জ্ঞান আছে তা ইনসাফের দাবী পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। অমুক ব্যক্তির মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে, সে চুরি করবে অথবা করতে যাচ্ছে, এ ধরনের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ বিচার করেন না। বরং সে চুরি করেছে—এ জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি বিচার করেন। এভাবে অমুক ব্যক্তি উন্নত পর্যায়ের মু'মিন ও মুজাহিদ হতে পারে অথবা হবে এ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তার ওপর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করেন না বরং অমুক ব্যক্তি নিজের কাজের মাধ্যমে তার সাচ্চা ঈমানদার হবার কথা প্রমাণ করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্র পথে জীবন সংগ্রাম করে দেখিয়ে দিয়েছে—এরি ভিত্তিতে বর্ষণ করেন। তাই আমি এ আয়াতের অনুবাদ করেছি "আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন।"

৪. যদিও আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত সকলের উদ্দেশ্যে এখানে বলা হতে পারে তবুও বিশেষভাবে এখানে বক্তব্যের লক্ষ হচ্ছে, কুরাইশদের সেই জালেম নেতৃবর্গ যারা ইসলামের বিরোধিতায় নেমে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর নিগ্রহ চালাবার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিল, যেমন ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল, উতবাহ, শাইবাহ, উক্বাহ ইবনে আবু মু'আইত, হানযালা ইবনে ওয়াইল এবং আরো অনেকে। এখানে পূর্বাপর বক্তব্যের স্বতস্ফূর্ত দাবী এই যে, পরীক্ষা তথা বিপদ–মুসীবত ও জুলুম–নিপীড়নের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দেবার পর এ সত্যপন্থীদের ওপর যারা জুলুম–নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে সম্বোধন করে ভীতি ও হুমকিমূলক কিছু কথাও বলা হোক।

৫. এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" মূল শব্দ হচ্ছে يَسْبِقُونَا অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই (অর্থাৎ আমার রসূলের মিশনের

সাফল্য) তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় (অর্থাৎ আমার রসূলকে হেয়প্রতিপন্ন করা) তা করতে তাদের সফল হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তাদের বাড়াবাড়ির জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাই এবং তারা পালিয়ে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৭. অর্থাৎ তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই।

৮. "মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাংখার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানে ও প্রতি দিকে। এ সম্পর্কেই হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন :

ان الرجل ليجاهدوماضرب يوما من الدهر بسيف

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑦

আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো।[১০]

"মানুষ যুদ্ধ করে চলে, যদিও কখনো একবারও তাকে তলোয়ার চালাতে হয় না।"

৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তোমাদের এ যুদ্ধ ছাড়া তাঁর ইলাহী শাসন চলবে না, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথেই তোমরা দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে সৎকর্মশীলতা ও সত্যতার পথে চলতে পারবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং পরকালে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহ্র কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে।

১০. ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা-কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক-ইনসাফ ও সত্য-সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কন্ঠের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহ্র আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অংগ-প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে :

এক : মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।

দুই : তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।

পাপ ও দুষ্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

আমি মানুষকে নিজের পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোন (মা'বুদকে) আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি (আমার শরীক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না।[১১] আমার দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কি করছিলে।[১২] আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করে থাকবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত করবো।

ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে ঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশী ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।"

(১৬০ আয়াত)

সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।"

সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

"আল্লাহ্ তো কণামাত্রও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।"

১১. এ আয়াতটি সম্পর্কে মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা হচ্ছে, এটি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস–এর ব্যাপারে নাযিল হয়। তাঁর বয়স যখন আঠারো উনিশ বছর তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মা হাম্‌না বিনতে সুফিয়ান (আবু সুফিয়ানের ভাইঝি) যখন জানতে পারে যে, তার ছেলে মুসলমান হয়ে গেছে তখন সে বলে, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে ততক্ষণ আমি কিছুই পানাহার করবো না এবং ছায়াতেও বসবো না। মায়ের হক আদায় করা তো আল্লাহর হুকুম। কাজেই তুমি আমার কথা না মানলে আল্লাহরও নাফরমানী করবে। একথায় হযরত সা'দ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়। মক্কা মুআয্‌যমার প্রথম যুগে যেসব যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হতে পারে তারাও একই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাই সূরা লুকমানেও পূর্ণ শক্তিতে এ বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। (দেখুন ১৫ আয়াত)

আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের ওপর মা–বাপের হক হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সেই মা–বাপই যদি মানুষকে শির্‌ক করতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনে নেয়া উচিত নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অন্য কারো কথায় মানুষের এ ধরনের শিরক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারপর শব্দগুলি হচ্ছে : وَإِنْ جَاهَدَاكَ "যদি তারা দু'জন তোমাকে বাধ্য করার জন্য তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে" এ থেকে জানা গেলো, কম পর্যায়ের চাপ প্রয়োগ বা বাপ–মায়ের মধ্য থেকে কোন একজনের চাপ প্রয়োগ আরো সহজে প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। এই সংগে مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না) বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্যই এটা পিতা–মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ অনুসরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ–মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ–মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ–মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

১২. অর্থাৎ এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের অধিকার কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা–ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা–মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা–মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَىِٕنْ جَاۗءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۭ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ⑩ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ⑪

লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি[১৩] কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহিত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে।[১৪] এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম।"[১৫] বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ্ ভালোভাবে জানেন না? আর আল্লাহ্ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক।[১৬]

হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথ ভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

১৩. যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি।" ইমাম রাযী এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি বলেন, মুনাফিক সবসময় নিজেকে মু'মিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মু'মিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও কারানির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে মরে যাবার পর কুফরীর অপরাধে যে জাহান্নামের আযাব

ভোগ করতে হবে আল্লাহর সেই জাহান্নামের আযাব কিছুটা এ ধরনেরই হবে। তাই সে সিদ্ধান্ত করে, সে আযাব তো পরে ভোগ করবো কিন্তু এখন এ নগদ আযাব যা পাচ্ছি তার হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্য আমাকে ঈমান ত্যাগ করে কুফরীর মধ্যে চলে যাওয়া উচিত। এভাবে দুনিয়ার জীবনটাতো নিশ্চিন্তে আরামের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে।

১৫. অর্থাৎ আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয় কিন্তু যখন এ দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়–দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলমানদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি।

এ প্রসংগে আরো এতটুকু কথা জেনে রাখতে হবে যে, অসহনীয় নিপীড়ন, ক্ষতি বা মারাত্মক ভীতিজনক অবস্থায় কোন ব্যক্তির কুফরী কথা বলে নিজেকে রক্ষা করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আন্তরিকতা সহকারে ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু যে আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি অক্ষম অবস্থায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরীর প্রকাশ করে এবং যে সুবিধাবাদী লোকটি আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে ইসলামকে সত্য জানে এবং সে হিসেবে তাকে মানে কিন্তু ঈমানী জীবনধারার বিপদ ও বিঘ্ন–বিপত্তি দেখে কাফেরদের সাথে হাত মিলায় তাদের দু'জনের মধ্যে ফারাকটি অনেক বড়। আপাত দৃষ্টিতে তাদের দু'জনের অবস্থা পরস্পর থেকে কিছু বেশী ভিন্ন মনে হবে না কিন্তু আসলে যে জিনিসটি তাদের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে এই যে, বাধ্য হয়ে কুফরীর প্রকাশকারী আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি কেবলমাত্র আকীদার দিক দিয়ে ইসলামের ভক্ত থাকে না বরং কার্যতও তার আন্তরিক সহানুভূতি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই থাকে। তাদের সাফল্যে সে খুশী হয় এবং তাদের ব্যর্থতা তাকে অস্থির করে তোলে। অক্ষম অবস্থায়ও সে মুসলমানদের সাহায্য করার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তার ওপর ইসলামের শত্রুদের বাঁধন যখনই ঢিলে হয়ে যায় সংগে সংগেই সে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, এ সুযোগের অপেক্ষায়ই থাকে সে। পক্ষান্তরে সুযোগ সন্ধানী লোক যখনই দেখে ইসলামের পথ কঠিন হয়ে গেছে এবং খুব ভালভাবে মাপজোক করে দেখে নেয়, ইসলামের সহযোগী হবার ক্ষতি কাফেরদের সাথে সহযোগিতা করার লাভের চেয়ে বেশী তখনই সে নিছক নিরাপত্তা ও লাভের খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষে তাদের জন্য এমন কোন কাজ করতে সে পিছপাও হয় না যা ইসলামের মারাত্মক বিরোধী এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এই সাথে হয়তো কোন সময় ইসলামের বিজয় সাধিত হতে পারে, এ সম্ভাবনার দিক থেকেও সে একেবারে চোখ বন্ধ করে রাখে না। তাই যখনই মুসলমানদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় তখনই সে তাদের আদর্শকে সত্য বলে মেনে নেবার, তাদের সামনে নিজের ঈমানের অংগীকার করার এবং সত্যের পথে ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য তাদেরকে বাহবা দেবার ব্যাপারে একটুও কার্পণ্য করে না। এ মৌখিক

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑫ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑬

এ কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো এবং আমরা তোমাদের গোনাহখাতাগুলো নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো,[১৭] অথচ তাদের গোনাহখাতার কিছুই তারা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে না,[১৮] তারা ডাহা মিথ্যা বলছে। হাঁ নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বোঝাও বইবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্য অনেক বোঝাও।[১৯] আর তারা যে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[২০]

স্বীকৃতিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনের সময় সে তাকে কাজে লাগাতে চায়। কুরআন মজীদ অন্য এক জায়গায় মুনাফিকদের এ বেনিয়া মানসিকতাকে এভাবে বর্ণনা করেছে :

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ দেখছে অবস্থা কোন্‌দিকে মোড় নেয়)। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়, তাহলে এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না এবং এরপরও তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাইনি? (আন নিসা, ১৪১)

১৬. অর্থাৎ মু'মিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যাকিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ্ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। একথাটিই সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"আল্লাহ মু'মিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো)। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।" (১৭৯ আয়াত)

১৭. তাদের এ উক্তির অর্থ ছিল, প্রথমত মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর–নশর, হিসেব ও শাস্তি–পুরস্কারের এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি পরকালের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের ধর্মের দিকে ফিরে এসো। হাদীসে বিভিন্ন কুরাইশ সরদার সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথমদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাত করে এ সরদাররা এমনি ধরনের কথা বলতো। তাই হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন তিনি ঈমান আনেন, আবু সুফিয়ান ও হারব্ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খাল্ফও তাঁর সাথে সাক্ষাত করে একথাই বলেছিল।

১৮. অর্থাৎ প্রথমত এটা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অন্যের দায়–দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে পারে না এবং কারো বলার কারণে গোনাহকারী নিজের গোনাহের শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কারণ সেখানে তো প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না) কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি এমনটি হয়ও, তাহলে যে সময় কুফরী ও শিরকের পরিণতি একটি প্রজ্বলিত জাহান্নামের আকারে সামনে এসে যাবে তখন কার এত বড় বুকের পাটা হবে যে, সে দুনিয়ায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসে বলবে, জনাব! আমার কথায় যে ব্যক্তি ঈমান ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিল আপনি তাকে মাফ করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিন এবং আমি জাহান্নামে নিজের কুফরীর সাথে সাথে তার কুফরীর শাস্তিও ভোগ করতে প্রস্তুত আছি।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে যদিও তারা নিজেদের বোঝার সাথে অন্যের বোঝা বইবে না কিন্তু দ্বিগুণ বোঝা উঠানোর হাত থেকে নিষ্কৃতিও পাবে না। তাদের ওপর চাপবে তাদের নিজেদের গোমরাহ হবার একটি বোঝা। আর দ্বিতীয় একটি বোঝাও তাদের ওপর চাপানো হবে অন্যদের গোমরাহ করার। একথাটিকে এভাবে বলা যায়, এক ব্যক্তি নিজেও চুরি করে এবং অন্য ব্যক্তিকেও তার সাথে এ কাজে অংশ নিতে বলে। এখন যদি এ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কথায় চুরি করায় অংশ নেয়, তাহলে অন্যের কথায় অপরাধ করেছে বলে কোন আদালত তাকে ক্ষমা করে দেবে না। চুরির শাস্তি অবশ্যই সে পাবে। ন্যায় বিচারের কোন নীতি অনুযায়ী তাকে রেহাই দিয়ে তার পরিবর্তে এ শাস্তি সেই প্রথম চোরটি যে তাকে ধোঁকা দিয়ে চৌর্যবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাকে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কিন্তু সেই প্রথম চোরটি তার নিজের অপরাধের সাথে সাথে অন্যজনকে চোরে পরিণত করার অপরাধের শাস্তিও পাবে। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

"যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।" (আন নাহল, ২৫)

আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন ঃ

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا

"যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহবান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্য কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।" (মুসলিম)

২০. 'মিথ্যাচার' মানে এমন সব মিথ্যা কথা যা কাফেরদের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে লুকিয়ে ছিল ঃ "তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহখাতাগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।" আসলে দু'টি বানোয়াট চিন্তার ভিত্তিতে তারা একথা বলতো। একটি হচ্ছে, তারা যে শিরকীয় ধর্মের অনুসরণ করে চলছে তা সত্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদী ধর্ম মিথ্যা। আর দ্বিতীয় বানোয়াট চিন্তাটি হচ্ছে, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না এবং পরকালের জীবনের এ ধ্যান-ধারণা যার কারণে একজন মুসলমান কুফরী করতে ভয় পায়, এটা একেবারেই অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। এ বানোয়াট চিন্তা নিজেদের মনে পোষণ করার পর তারা একজন মুসলমানকে বলতো, ঠিক আছে, তোমাদের মতে কুফরী করা যদি গোনাহই হয় এবং কোন কিয়ামতও যদি অনুষ্ঠিত হবার থাকে যেখানে এ গোনাহের কারণে তোমাদের জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে আমরা তোমাদের এ গোনাহ নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছি, আমাদের দায়িত্বে তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এসো। এ ব্যাপারের সাথে আরো দু'টি মিথ্যা কথাও জড়িত ছিল। তার একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্যের কথায় কোন অপরাধ করে সে নিজের অপরাধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে এবং যার কথায় সে এ অপরাধ করে সে এর পূর্ণ দায়ভার উঠাতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা যথার্থই তাদের দায়ভার মাথায় তুলে নেবে, যারা তাদের কথায় ঈমান পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে ফিরে গিয়েছিল। কারণ, যখন কিয়ামত সত্যি সত্যি কায়েম হয়ে যাবে

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই[২১] এবং সে তাদের মধ্যে থাকে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর।[২২] শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন অবস্থায় যখন তারা জালেম ছিল।[২৩] তারপর আমি নূহকে ও নৌকা আরোহীদেরকে[২৪] রক্ষা করি এবং একে বিশ্ববাসীর জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন করে রাখি।[২৫]

এবং তাদের আশা–আকাংখার বিরুদ্ধে জাহান্নাম তাদের চোখের সামনে বিরাজ করবে। তখন তারা কখনোই নিজেদের কুফরীর শাস্তি পাওয়ার সাথে সাথে যাদেরকে তারা দুনিয়ায় ধোঁকা দিয়ে গোমরাহ করতো তাদের গোনাহের সমস্ত বোঝাও নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিতে রাজি হবে না।

২১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৩৩–৩৪; আন নিসা, ১৬৩; আল আন'আম, ৮৪; আল আ'রাফ, ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ ও ৭৩; হূদ, ২৫ ও ৪৮; আল আম্বিয়া, ৭৬ ও ৭৭; আল মু'মিনূন, ২৩ ও ৩০; আল ফুরকান, ৩৭; আশ্ শূআরা, ১০৫ থেকে ১২৩; আস্ সাফ্ফাত, ৭৫ ও ৮২; আল কামার, ৯০; আল হাক্কাহ, ১১ ও ১২ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

যে পটভূমিতে এখানে এ কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে হলে সূরার প্রথমদিকের আয়াতগুলো সামনে রাখতে হবে। সেখানে একদিকে মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের আগে যেসব মু'মিন অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে আমি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি। অন্যদিকে জালেম কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে এবং আমার পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। এ দু'টি কথা উপলব্ধি করার জন্য এ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

২২. এর অর্থ এ নয় যে, হযরত নূহের বয়স ছিল সাড়ে ন'শো বছর। বরং এর অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের দায়িত্বলাভ করার পর থেকে মহাপ্লাবন পর্যন্ত সাড়ে ন'শো বছর হযরত নূহ এই জালেম ও গোমরাহ জাতির সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের জুলুম–নির্যাতন বরদাশ্ত করার পরও তিনি হিম্মতহারা হননি। এখানে এ জিনিসটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো মাত্র পাঁচ বছর থেকে জুলুম–নির্যাতন সহ্য করছো এবং একটি গোমরাহ জাতির হঠকারিতা

বরদাশত করে চলছো কিন্তু আমার এ বান্দা যে অনবরত সাড়ে ন'শো বছর ধরে এসবের মোকাবিলা করেছে তার সবর ও দৃঢ়তার কথা ভেবে দেখো।

হযরত নূহের বয়সের ব্যাপারে কুরআন মজীদ ও বাইবেলের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। বাইবেল বলে, তাঁর বয়স ছিল সাড়ে ন'শো বছর। তাঁর বয়স যখন ছ'শো বছর তখন প্লাবন আসে। এরপর তিনি আর সাড়ে তিনশো বছর জীবিত থাকেন। (আদি পুস্তক ৭ ঃ ৬, ৯ ঃ ২৮–২৯) কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স অন্তত এক হাজার বছর হওয়া উচিত। কারণ সাড়ে ন'শো বছর তো হচ্ছে শুধুমাত্র নবুওয়াতের দায়িত্বে আসীন হবার পর থেকে নিয়ে প্লাবন শুরু হওয়া পর্যন্তকার সময়টি। এ সময়–কালটি তিনি ব্যয় করেন দীনের দাওয়াত দেবার ও তার প্রচারের কাজে। একথা সুস্পষ্ট, জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি পরিপক্কতা অর্জন করেছেন এমন এক বয়সেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন এবং প্লাবনের পরও তিনি কিছুকাল জীবিত থেকে থাকবেন।

এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর এ বিশ্বে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অভাব নেই। যেদিকেই তাকানো যাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আকারে দৃষ্টিগোচর হবে। কিছু ঘটনা ও অবস্থার প্রথমত একটি বিশেষ আকারে আত্মপ্রকাশ করে যেতে থাকাটা এমন কোন যুক্তি পেশ করে না যার ফলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, অন্য কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় ভিন্নধর্মী কোন ঘটনা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এ পর্যায়ের ধারণাগুলোর ভিত ধসিয়ে দেবার জন্য বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন স্থানে এবং সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রজাতির মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। বিশেষ করে যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর অসীম শক্তিশালী হবার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে সে কখনো জীবন মৃত্যুর স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষে কোন মানুষকে এক হাজার বছর বা তার চেয়ে কম–বেশী বয়স দান করা সম্ভব নয়, এ ধরনের কোন ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে না। আসলে মানুষ নিজে চাইলেও এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ চাইলে যতদিন যত বছর চান তাকে জীবিত রাখতে পারেন।

২৩. অর্থাৎ তারা নিজেদের জুলুম–নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকা অবস্থায় মহাপ্লাবনের গ্রাসে পরিণত হয়। অন্য কথায়, যদি মহাপ্লাবন আসার আগে তারা নিজেদের জুলুম–নিপীড়ন থেকে বিরত হতো তাহলে আল্লাহ তাদের ওপর এ আযাব পাঠাতেন না।

২৪. অর্থাৎ যারা হযরত নূহের (আ) প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং যাদেরকে আল্লাহ নৌকায় আরোহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সূরা হূদে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۗ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ –

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

আর ইবরাহীমকে পাঠাই[২৬] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাঁকে ভয় করো।[২৭] এটা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানো। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো তারাতো নিছক মূর্তি আর তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করছো।[২৮] আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা পূজা করো তারা তোমাদের কোন রিযিকও দেবার ক্ষমতা রাখে না, আল্লাহর কাছে রিযিক চাও, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[২৯] আর যদি তোমরা মিথ্যা আরোপ করো, তাহলে পূর্বে বহু জাতি মিথ্যা আরোপ করেছে[৩০] এবং রসূলের ওপর পরিষ্কারভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।"

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো তখন আমি বললাম, (হে নূহ) এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর (প্রাণীদের) এক এক জোড়া এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে। তবে যাদেরকে সংগে না নেবার জন্য পূর্বেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কথা আলাদা। আর তার সাথে ঈমান এনেছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন।" (৪০ আয়াত)

২৫. এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ভয়াবহ শাস্তি অথবা এ যুগান্তকারী ঘটনাটিকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এবং সূরা কামারে একথাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নিদর্শন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃংগে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। সূরা আল কামারে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۙ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۙ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۙ

"আর নূহকে আমি আরোহণ করালাম তখতা ও পেরেকের তৈরি নৌকায়। তা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার স্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম একটি নিদর্শনে পরিণত করে; কাজেই আছে কি কেউ শিক্ষা গ্রহণকারী?" (১৩–১৫ আয়াত)

সূরা আল কামারের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর কাতাদার এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন : সাহাবীগণের আমলে মুসলমানরা যখন আল জাযীরায় যায় তখন তারা জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি বর্ণনা মতে বাকেরওয়া নামক জনবসতির কাছে) এ নৌকাটি দেখে। বর্তমানকালে মাঝে মাঝে এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে যে, নূহের নৌকা অনুসন্ধান করার জন্য অভিযাত্রী দল পাঠানো হচ্ছে। এর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, অনেক সময় বিমান আরারাতের পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার সময় আরোহীরা একটি পর্বতশৃংগে একটি নৌকার মতো জিনিস দেখেছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, ৪৭ এবং হূদ, ৪৬ টীকা)

২৬. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ১৫, ১৬ ও ৩৫; আলে ইমরান, ৭; আল আন'আম, ৯; হূদ, ৭; ইবরাহীম, ৬; আল হিজর, ৪; মারয়াম, ৩; আল আম্বিয়া, ৫; আশ শূ'আরা, ৫; আস্ সাফ্ফাত, ৩; আয্ যুখ্রুফ, ৩ এবং আয্ যারিয়াত, ২ রুকূ' সমূহ।

২৭. অর্থাৎ তাঁর সাথে কাউকে শরীক এবং তার নাফরমানী করতে ভয় করো।

২৮. অর্থাৎ তোমরা এ মূর্তি তৈরি করছো না বরং মিথ্যা তৈরি করছো। এ মূর্তিগুলোর অস্তিত্ব নিজেই একটি মূর্তিমান মিথ্যা। তার ওপর তোমাদের এ আকীদা–বিশ্বাস যে, এরা দেব–দেবী, আল্লাহর অবতার, তাঁর সন্তান, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ও তাঁর কাছে শাফা'আতকারী অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রোগ নিরাময়কারী আবার কেউ সন্তান–দাতা এবং কেউ রিযিকদাতা—এসবই মিথ্যা কথা। তোমরা নিজেদের ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে এসব রচনা করেছো। আসল সত্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এগুলো নিছক হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি এবং এদের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব নেই।

২৯. এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি একত্র করেছেন। কাউকে মাবুদ বা আরাধ্য করতে হলে এ জন্য যুক্তিসংগত কারণ থাকতে হবে। একটি যুক্তিসংগত কারণ এ হতে পারে যে, তার নিজের সত্তার মধ্যে মাবুদ হবার কোন অধিকার থাকে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষ নিজের অস্তিত্বের জন্য তার কাছে অনুগৃহীত। তৃতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের লালন–পালনের ব্যবস্থা করে। তাকে রিযিক তথা জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করে। চতুর্থ কারণ হতে পারে, মানুষের ভবিষ্যত তার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল এবং মানুষ আশংকা করে তার অসন্তুষ্টি অর্জন করলে তার নিজের পরিণাম অশুভ হবে। হযরত ইবরাহীম বলেন, এ চারটি কারণের কোন একটিও মূর্তি পূজার পক্ষে নয়। বরং এর

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

এরা[৩১] কি কখনো লক্ষ করেনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন? নিশ্চয়ই এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহর জন্য সহজতর।[৩২] এদেরকে বলো, পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো এবং দেখো তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।[৩৩] যাকে চান শাস্তি দেন এবং যার প্রতি চান করুণা বর্ষণ করেন, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা না পৃথিবীতে অক্ষমকারী, না আকাশে[৩৪] এবং আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।[৩৫]

প্রত্যেকটিই নির্ভেজাল আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের দাবী করে। "এ নিছক মূর্তিপূজা" বলে তিনি প্রথম কারণটিকে বিলুপ্ত করে দেন। কারণ নিছক মূর্তি মাবুদ হবার ব্যক্তিগত কি অধিকার লাভ করতে পারে? তারপর "তোমরা তাদের স্রষ্টা" একথা বলে দ্বিতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। এরপর তারা তোমাদের কোন প্রকারের কোন রিযিক দান করতে পারে না, একথা বলে তৃতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। আর সবশেষে বলেন, তোমাদের তো আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেই হবে, এ মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে যেতে হবে না। কাজেই তোমাদের পরিণাম ও পরকালকে সমৃদ্ধ বা ধ্বংস করার ক্ষমতাও এদের নেই। এ ক্ষমতা আছে একমাত্র আল্লাহর হাতে। এভাবে শিরককে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি তাদের ওপর একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মানুষ যে সমস্ত কারণে কাউকে মাবুদ বা আরাধ্য গণ্য করতে পারে তার কোনটাই এক ও লা-শারীক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদাত করার দাবী করে না।

৩০. অর্থাৎ যদি তোমরা আমার তাওহীদের দাওয়াতকে এবং তোমাদের নিজেদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং নিজেদের সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে—এসব

কথাকে মিথ্যা বলো, তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। ইতিহাসে এর পূর্বেও বহু নবী (যেমন নূহ, হূদ, সালেহ আলাইহিমুস সালাম প্রমুখগণ) এ একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের জাতিরাও তাঁদেরকে এমনিভাবেই মিথ্যুক বলেছে। এখন তারা এ নবীদেরকে মিথ্যুক বলে তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পেরেছে, না নিজেদের পরিণাম ধ্বংস করেছে, এটা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও।

৩১. এখান থেকে নিয়ে لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) পর্যন্ত আয়াতগুলো মূল আলোচনার মাঝখানে স্বতন্ত্র প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে আনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের কাহিনীর ধারা বর্ণনা ছিন্ন করে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে একথাগুলো বলেছেন। এ বিষয়ের সাথে এ প্রাসংগিক ভাষণের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, মক্কার যে কাফেরদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এ ভাষণ দেয়া হচ্ছে তারা দু'টি মৌলিক গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। একটি ছিল শির্‌ক ও মূর্তিপূজা এবং অন্যটি ছিল আখেরাত অস্বীকৃতি। এর মধ্য থেকে প্রথম গোমরাহীকে বাতিল করা হয়েছে হযরত ইবরাহীমের ওপরে উদ্ধৃত ভাষণের মাধ্যমে। এখন দ্বিতীয় গোমরাহীটিকে বাতিল করার জন্য আল্লাহ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এ বাক্য কয়টি বলছেন। এভাবে একই বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে দু'টি বিষয়কেই বাতিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ একদিকে অসংখ্য বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে এবং অন্যদিকে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বিলুপ্তির সাথে সাথে আবার নতুন ব্যক্তিবর্গ অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। মুশরিকরা এসব কিছুকে আল্লাহর সৃষ্টি ও উদ্ভাবন গুণের ফল বলে মানতো। আজকের যুগের মুশরিকরা যেমন আল্লাহর স্রষ্টা হবার কথা অস্বীকার করে না তেমনি তারাও একথা অস্বীকার করতো না। তাই তাদের স্বীকৃত কথার ওপর এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যে আল্লাহ বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন এবং তারপর মাত্র একবার সৃষ্টি করে শেষ করেন না বরং তোমাদের চোখের সামনে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর জায়গায় আবার একই জিনিস অনবরত সৃষ্টি করে চলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমরা কেমন করে একথা ভাবতে পারলে যে, তোমাদের মরে যাবার পর তিনি আর পুনর্বার তোমাদের জীবিত করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নাম্‌ল, ৮০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহর শিল্পকারিতার বদৌলতে প্রথমবারের সৃষ্টি তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছো তখন তোমাদের বুঝা উচিত, একই আল্লাহর শিল্পকারিতার মাধ্যমে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কাজ করা তাঁর ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয় এবং আওতা বহির্ভূত হতেও পারে না।

৩৪. অর্থাৎ তোমরা পালিয়ে এমন কোন জায়গায় চলে যেতে পারো না যেখানে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো। তোমরা ভূগর্ভের তলদেশে কোথাও নেমে যাও অথবা আকাশের কোন উচ্চ মার্গে পৌঁছে যাও না কেন সব জায়গা থেকেই তোমাদেরকে ধরে আনা হবে এবং নিজেদের রবের সামনে হাজির করা হবে। সূরা আর রাহমানে এ কথাটিই জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জের সুরে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে একটু

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

যারা আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে[৩৬] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তারপর[৩৭] সেই জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বললো, "একে হত্যা করো অথবা পুড়িয়ে ফেলো।"[৩৮] শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন।[৩৯] অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।[৪০]

বের হয়ে দেখিয়ে দাও। তা থেকে বের হবার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই তোমরা কোনক্রমেই বের হতে পারো না ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ – الرحمن : ٢٣

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোন অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে। যারা শিরক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর বিধানের সামনে নত হতে অস্বীকার করেছে এবং বুক ফুলিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এং তাঁর যমীনে ব্যাপকভাবে জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, সমগ্র বিশ্ব–জাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবের ফায়সালাকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা সমগ্র বিশ্ব–জগতে এমন একজনও নেই যে আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে একথা বলার সাহস রাখে যে, এরা আমার লোক কাজেই এরা যা কিছু করেছে তা মাফ করে দেয়া হোক।

৩৬. অর্থাৎ আমার রহমতে তাদের কোন অংশ নেই। আমার অনুগ্রহের অংশ লাভের আশা করার কোন অবকাশ তাদের জন্য নেই। একথা সুস্পষ্ট যখন তারা আল্লাহর আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করলো তখন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা

থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের লাভবান হবার অধিকার প্রত্যাহার করে নিলেন। তারপর যখন তারা আখেরাত অস্বীকার করলো এবং কখনো তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে একথা স্বীকারই করলো না তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা আল্লাহর দান ও মাগফেরাতের সাথে কোন প্রকার আশার সম্পর্ক রাখেনি। এরপর যখন নিজেদের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে তারা আখেরাতের জগতে চোখ খুলবে এবং আল্লাহর যেসব আয়াতকে তারা মিথ্যা বলেছিল সেগুলোকেও সত্য হিসেবে স্বচক্ষে দেখে নেবে তখন সেখানে আল্লাহর রহমতের অংশ লাভের প্রার্থী হবার কোন কারণ তাদের থাকতে পারে না।

৩৭. এখান থেকে বর্ণনা আবার হযরত ইবরাহীমের কাহিনীর দিকে মোড় নিচ্ছে।

৩৮. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের ন্যায়সংগত যুক্তির কোন জবাব তাদের কাছে ছিল না। তাদের যদি কোন জবাব থেকে থাকে তাহলে তা এই ছিল যে, হক কথা বলছে যে কণ্ঠটি সেটি স্তব্ধ করে দাও এবং যে ব্যক্তি আমাদের ভুল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে তাকে জীবন্ত রেখো না। "হত্যা করো ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো" শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, সমগ্র জনতা হযরত ইবরাহীমকে মেরে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল তবে মেরে ফেলার পদ্ধতির ব্যাপারে ছিল বিভিন্ন মত। কিছু লোকের মত ছিল, তাঁকে হত্যা করা হোক। আবার কিছু লোকের মত ছিল, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক, এর ফলে ভবিষ্যতে যারা এ ভূখণ্ডে হক কথা বলার পাগলামী করতে চাইবে এটা তাদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।

৩৯. এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ হয় যে, তারা শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীমকে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত করেছিল। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তাঁকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু সূরা আল আম্বিয়ায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে : আল্লাহর নির্দেশে আগুন হযরত ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ বস্তু হয়ে যায়, قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ "আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি।" (৬৯ আয়াত) একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁকে যদি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপই না করা হয়ে থাকতো তাহলে আগুনকে ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও এ হুকুম দেবার কোন অর্থই হয় না। এ থেকে একথা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত বস্তুর ধর্ম বা প্রকৃতি মহান আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যখনই চান যে কোন বস্তুর ধর্ম ও বিশেষত্ব পরিবর্তন করতে পারেন। সাধারণভাবে আগুনের ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো এবং দগ্ধীভূত হবার মতো প্রত্যেকটি জিনিসকে পুড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আগুনের এ ধর্ম তার নিজের প্রতিষ্ঠিত নয় বরং আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। তার এ ধর্মটি আল্লাহকে এমনভাবে বেঁধে ফেলেনি যে, তিনি এর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দিতে পারেন না। তিনি নিজের আগুনের মালিক। যে কোন সময় তিনি তাকে জ্বালাবার কাজ পরিত্যাগ করার হুকুম দিতে পারেন। কোন সময় নিজের এক ইংগিতে তিনি অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগানে পরিণত করতে পারেন। এ অস্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় তাঁর রাজ্যে প্রতিদিন হয় না। কোন বড় রকমের তাৎপর্যবহ শিক্ষা ও প্রয়োজনের খাতিরেই হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়মমাফিক যেসব জিনিস প্রতিদিন দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেগুলোকে কোনক্রমেই এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে না যে, সেগুলোর

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

আর সে বললো,[৪১] "তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়েছো।[৪২] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার এবং পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করবে[৪৩] আর আগুন তোমাদের আবাস হবে এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।" সে সময় লূত তাকে মেনে নেয়[৪৪] এবং ইবরাহীমকে বলে, আমি আমার রবের দিকে হিজরাত করছি,[৪৫] তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।[৪৬]

মধ্যে তাঁর শক্তি আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিয়ম বিরোধী কোন ঘটনা আল্লাহর হুকুমেও সংঘটিত হতে পারে না।

৪০. এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য এ মর্মে নিদর্শন রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরিবার, বংশ, জাতি ও দেশের ধর্ম পরিত্যাগ করে যে সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি শির্কের অসারতা ও তাওহীদের সত্যতা জানতে পেরেছিলেন তারই অনুসরণ করেন। আবার এ মর্মেও নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি নিজ জাতির হঠকারিতা ও কঠোর জাতীয় স্বার্থ প্রীতি ও বিদ্বেষ অগ্রাহ্য করে তাকে মিথ্যার পথ থেকে সরিয়ে আনার ও সত্য গ্রহণ করার জন্য অনবরত প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। তাছাড়া এ ব্যাপারেও নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি আগুনের ভয়াবহ শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করতে প্রস্তুত হননি। নিদর্শন এ ব্যাপারেও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও পরীক্ষার পুলসেরাত পার না করিয়ে ছাড়েননি। আবার এ ব্যাপারেও যে, হযরত ইবরাহীমকে আল্লাহ যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তাতে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন, তবেই আল্লাহর সাহায্য তাঁর জন্য আসে এবং এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে আসে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়।

৪১. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, আগুনের মধ্য থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পর হযরত ইবরাহীম (আ) লোকদেরকে একথা বলেন।

৪২. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে মূর্তিপূজার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছো। এ ব্যবস্থা দুনিয়ার জীবনের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় সত্ত্বাকে একত্র করে রাখতে পারে। কারণ এখানে সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যে কোন আকীদার ভিত্তিতে লোকেরা একত্র হতে পারে। আর যত বড় মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর আকীদার ভিত্তিতেই যে কোন ঐক্য ও সমাজ গড়ে উঠুক না কেন তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য সকল ধর্মীয়, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে।

৪৩. অর্থাৎ মিথ্যা আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ সামাজিক কাঠামো আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার কেবলমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা দুনিয়ায় এক আল্লাহর বন্দেগী এবং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফরী ও শিরক এবং ভুল পথ ও কুপথের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পীর-মুরীদ পর্যন্ত একে অন্যের ওপর লানত বর্ষণ করবে এবং প্রত্যেকে নিজের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবে, এই জালেম আমাকে ধ্বংস করেছে, কাজেই একে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। একথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। যেমন সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَ خِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

"বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" (৬৭ আয়াত)

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ـ

"প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার কাছের দলের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের পক্ষে বলবে ঃ হে আমাদের রব ! এ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করে, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।" (৩৮ আয়াত)

সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۗءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۔ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۔

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

আর আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করি[৪৭] এবং তার বংশধরদের মধ্যে রেখে দিই নবুওয়াত ও কিতাব[৪৮] এবং তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিদান দিই আর আখেরাতে সে নিশ্চিতভাবেই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে।[৪৯]

"আর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের বিপথগামী করেছে। হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড় রকমের লানত বর্ষণ করো।"

(৬৭-৬৮ আয়াত)

৪৪. বক্তব্যের বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আগুন থেকে বের হয়ে আসেন এবং তিনি ওপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলেন, তখন সমগ্র সমবেত জনতার মধ্য থেকে একমাত্র হযরত লূত (আ) তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। হতে পারে সে সময় আরো বহুলোক মনে মনে হযরত ইবরাহীমের সত্যতা স্বীকার করে থাকবে। কিন্তু সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইবরাহীমের দীনের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ও আক্রোশ প্রবণতার প্রকাশ সে সময় সবার চোখের সামনে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করে কোন ব্যক্তি এ ধরনের ভয়ংকর সত্য মেনে নেবার এবং তার সাথে সহযোগিতা করার সাহস করতে পারেনি। এ সৌভাগ্য মাত্র এক ব্যক্তিরই হয়েছিল এবং তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীমেরই ভাতিজা হযরত লূত (আ)। শেষে তিনি হিজরাতকালেও নিজের চাচা ও চাচীর (হযরত সারাহ) সহযোগী হয়েছিলেন।

এখানে একটি সন্দেহ দেখা দেয় এবং এ সন্দেহটি নিরসন করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে যে, তাহলে এ ঘটনার পূর্বে কি হযরত লূত কাফের ও মুশরিক ছিলেন এবং আগুন থেকে হযরত ইবরাহীমের নিরাপদে বের হয়ে আসার অলৌকিক কাণ্ড দেখার পর তিনি ঈমানের নিয়ামত লাভ করেন? যদি একথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে নবুওয়াতের আসনে কি এমন কোন ব্যক্তি সমাসীন হতে পারেন যিনি পূর্বে মুশরিক ছিলেন? এর জবাব হচ্ছে, কুরআন এখানে فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এ থেকে অনিবার্য হয়ে ওঠে না যে, ইতিপূর্বে হযরত লূত বিশ্ব-জাহানের প্রভু আল্লাহকে না মেনে থাকবেন বা তাঁর সাথে অন্য মাবুদদেরকেও শরীক করে থাকবেন বরং এ থেকে কেবলমাত্র এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনার পর তিনি হযরত ইবরাহীমের রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। ঈমানের

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

আর আমি লূতকে পাঠাই[৫০] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, "তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি। তোমাদের অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছো,[৫১] রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে খারাপ কাজ করছো?"[৫২] তারপর তার সম্প্রদায়ের কাছে এ ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "নিয়ে এসো আল্লাহর আযাব যদি তুমি সত্যবাদী হও।" লূত বললো, "হে আমার রব! এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।"

সাথে যখন লাম (ل) শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় কোন ব্যক্তির কথা মেনে নেয়া এবং তার আনুগত্য করা। হতে পারে হযরত লূত তখন ছিলেন একজন উঠতি বয়সের তরুণ এবং সচেতনভাবে নিজের চাচার শিক্ষার সাথে তিনি এ প্রথমবার পরিচিত হবার এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে থাকবেন।

৪৫. অর্থাৎ আমার রবের জন্য হিজরাত করছি। এখন আমার রব আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে যাবো।

৪৬. অর্থাৎ তিনি আমাকে সহায়তা দান ও হেফাজত করার ক্ষমতা রাখেন এবং আমার পক্ষে তিনি যে ফায়সালা করবেন তা বিজ্ঞজনোচিতই হবে।

৪৭. হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র এবং হযরত ইয়াকূব ছিলেন পৌত্র। এখানে হযরত ইবরাহীমের (আ) অন্যান্য পুত্রদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম সন্তানদের মাদ্‌য়ানী শাখায় কেবলমাত্র হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামই নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসমাঈলী শাখায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরে আর কোন নবী আসেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম থেকে যে শাখাটি চলে তার মধ্যে একের পর এক হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত প্রদত্ত হতে থাকে।

৪৮. হযরত ইবরাহীমের (আ) পরে যেসব নবীর আবির্ভাব হয় সবাই এর মধ্যে এসে গেছেন।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظٰلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

আর যখন আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছুলো,[৫৩] তারা তাকে বললো, "আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো,[৫৪] এর অধিবাসীরা বড়ই জালেম হয়ে গেছে।" ইবরাহীম বললো "সেখানে তো লূত আছে।"[৫৫] তারা বললো, "আমরা ভালোভাবেই জানি সেখানে কে কে আছে, আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো তার স্ত্রীকে ছাড়া;" সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত।[৫৬]

৪৯. এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, ব্যবিলনের যেসব শাসক, পণ্ডিত ও পুরোহিত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল এবং সেখানকার যে সকল মুশরিক অধিবাসী চোখ বন্ধ করে ঐ জালেমদের আনুগত্য করেছিল তারা সবাই দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, আজ দুনিয়ার কোথাও তাদের কোন নাম নিশানাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে আল্লাহ এমন সফলতা দান করেন যে, চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে তাঁর নাম সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী রব্বুল আলামীনের সেই খলীল তথা বন্ধুকে একযোগে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে। এ চল্লিশ'শ বছরে দুনিয়া একমাত্র সেই পাক-পবিত্র ব্যক্তি এবং তাঁর সন্তানদের থেকেই যা কিছু হিদায়াতের আলোক বর্তিকা লাভ করতে পেরেছে। আখেরাতে তিনি যে মহাপুরস্কার লাভ করবেন তাতো তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে কিন্তু এ দুনিয়ায়ও তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টায় জীবনপাতকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি।

৫০. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ, ১০; হূদ, ৭; আল হিজর, ৪-৫; আল আম্বিয়া, ৫; আশ শু'আরা, ৯; আন নাম্‌ল, ৪; আস্‌ সাফ্‌ফাত, ৪ ও আল কামার, ২ রুকূ'।

৫১. অর্থাৎ তাদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হচ্ছো, যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ

"তোমরা যৌন কামনা পূর্ণ করার জন্য মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে গিয়ে থাকো।"

৫২. অর্থাৎ এ অশ্লীল কাজটি লুকিয়ে চাপিয়েও করো না বরং প্রকাশ্যে নিজেদের মজলিসে পরস্পরের সামনে করে থাকো। একথাটিই সূরা আন নামূলে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ

"তোমরা কি এমনই বিগড়ে গিয়েছো যে, প্রকাশ্যে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষেই অশ্লীল কাজ করে থাকো?"

৫৩. সূরা হূদ ও সূরা হিজ্‌রে এর যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য যেসব ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রথমে হযরত ইবরাহীমের কাছে হাজির হন এবং তাঁকে হযরত ইসহাকের এবং তাঁর পর হযরত ইয়াকূবের জন্মের সুসংবাদ দেন তারপর বলেন, লূতের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।

৫৪. "এ জনপদ" বলে লূত জাতির সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মরুসাগরের (Dead Sea) অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়। এ এলাকাটি নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত এবং জাবরুনের উঁচু উঁচু পর্বতগুলো থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই ফেরেশতারা সেদিকে ইংগিত করে হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "আমরা এ জনপদটি ধ্বংস করে দেবো।" (দেখুন সূরা আশ্ শু'আরা, ১১৪ টীকা)

৫৫. সূরা হূদে এ কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশ্তাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখে ভয় পেয়ে যান। কারণ এ আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন কোন ভয়াবহ অভিযানের পূর্বাভাস দেয়। তারপর যখন তাঁরা তাঁকে সুসংবাদ দান করেন এবং তাঁর ভীতি দূর হয়ে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, লূতের জাতি হচ্ছে এ অভিযানের লক্ষ। তাই সে জাতির জন্য তিনি করুণার আবেদন জানাতে থাকেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

কিন্তু তাঁর এ আবেদন গৃহীত হয়নি এবং বলা হয় এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলো না। তোমার রবের ফায়সালা হয়ে গেছে এ আযাবকে এখন আর ফেরানো যাবে না ঃ

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَاۤ اٰیَةًۢ بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۳۵﴾

তারপর যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের কাছে পৌঁছুলো তাদের আগমনে সে অত্যন্ত বিব্রত ও সংকুচিত হৃদয় হয়ে পড়লো।[৫৭] তারা বললো, "ভয় করো না এবং দুঃখও করো না।[৫৮] আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত। আমরা এ জনপদের লোকদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি তারা যে পাপাচার করে আসছে তার কারণে।" আর আমি সে জনপদের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি[৫৯] তাদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।[৬০]

يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

এ জবাবের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বুঝতে পারেন লূত জাতির জন্য আর কোন অবকাশের আশা নেই তখনই তাঁর মনে জাগে হযরত লূতের চিন্তা। তিনি যা বলেন তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন "সেখানে তো লূত রয়েছে।" অর্থাৎ এ আযাব যদি লূতের উপস্থিতিতে নাযিল হয় তাহলে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ তা থেকে কেমন করে নিরাপদ থাকবেন।

৫৬. এ মহিলা সম্পর্কে সূরা তাহরীমে (১০ আয়াত) বলা হয়েছে ঃ হযরত লূতের এই স্ত্রী তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

সম্ভবত হিজরাত করার পর হযরত লূত জর্দান এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকবেন এবং তখনই তিনি এ জাতির মধ্যে বিয়ে করে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে জীবনের একটি বিরাট অংশ পার করে দেবার পরও এ মহিলা ঈমান আনেনি এবং তার সকল সহানুভূতি ও আকর্ষণ নিজের জাতির ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। যেহেতু আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয়

তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়।

৫৭. এ বিব্রতবোধ ও সংকুচিত হৃদয় হবার কারণ এই ছিল যে, ফেরেশতারা উঠতি বয়সের সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী তরুণদের রূপ ধরে এসেছিলেন। হযরত লূত নিজের জাতির চারিত্রিক ও নৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাদের আসা মাত্রই তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এ জন্য যে, তিনি যদি এ মেহমানদেরকে অবস্থান করতে দেন তাহলে ঐ ব্যভিচারী জাতির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে আর যদি অবস্থান করতে না দেন তাহলে সেটা হবে বড়ই অভদ্র আচরণ। তাছাড়া এ আশংকাও আছে, তিনি যদি এ মুসাফিরদেরকে আশ্রয় না দেন তাহলে অন্য কোথাও তাদের রাত কাটাতে হবে এবং এর অর্থ হবে যেন তিনি নিজেই তাদেরকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন। এর পরের ঘটনা আর এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সূরা হূদ ও কামারে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এ কিশোরদের আগমন সংবাদ শুনে শহরের বহু লোক হযরত লূতের গৃহে এসে ভীড় জমালো। তারা ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত হবার উদ্দেশে মেহমানদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য চাপ দিতে লাগলো।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে। এরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে এ ভয়ও করো না এবং এদের হাত থেকে কিভাবে আমাদের বাঁচাবে সে চিন্তাও করো না। এ সময়ই ফেরেশতারা হযরত লূতের কাছে এ রহস্য ফাঁস করেন যে, তারা মানুষ নন বরং ফেরেশ্‌তা এবং এ জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সূরা হূদে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে, লোকেরা যখন একনাগাড়ে লূতের গৃহে প্রবেশ করে চলছিল এবং তিনি অনুভব করছিলেন এখন আর কোনক্রমেই নিজের মেহমানদেরকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না তখন তিনি পেরেশান হয়ে চিৎকার করে বলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

"হায়! আমার যদি শক্তি থাকতো তোমাদের সোজা করে দেবার অথবা কোন শক্তিশালীর সহায়তা আমি লাভ করতে পারতাম।"

এ সময় ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ

يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ

"হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। এরা কখ্‌খনো তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না।

৫৯. এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মরুসাগর। একে লূত সাগরও বলা হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই জালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্য রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٣٦ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ۝٣٧ وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ۝٣٨

আর মাদ্‌য়ানের দিকে আমি পাঠালাম তাদের ভাই শু'আইবকে।[৬১] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, শেষ দিনের প্রত্যাশী হও[৬২] এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িও না।" কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৬৩] শেষে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে[৬৪] মরে পড়ে থাকলো।

আর আদ ও সামূদকে আমি ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে থাকতো সেসব জায়গা তোমরা দেখেছো[৬৫] তাদের কার্যাবলীকে শয়তান তাদের জন্য সুদৃশ্য বানিয়ে দিল এবং তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করলো অথচ তারা ছিল বুদ্ধি সচেতন।[৬৬]

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ (الحجر) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ (الصافات)

বর্তমান যুগে একথাটি প্রায় নিশ্চয়তা সহকারেই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে যে, মরুসাগরের দক্ষিণ অংশটি একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পজনিত ভূমিধ্বসের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এ ধ্বসে যাওয়া অংশেই অবস্থিত ছিল লূত জাতির কেন্দ্রীয় নগরী সাদোম (Sodom)। এ অংশে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে অত্যাধুনিক ডুবুরী সরঞ্জামের সহায়তায় কিছু লোকের নীচে নেমে ঐসব ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনো এ প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল জানা যায়নি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআর, সূরা শু'আরা, ১১৪ টীকা)

৬০. লূতের জাতির কর্মের শরীয়াতবিহিত শাস্তির জন্য দেখুন, 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা আ'রাফ, ৬৮ টীকা।

৬১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আ'রাফ, ১১; হূদ, ৮ এবং আশ্‌ শু'আরা, ১০ রুকূ'।

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

আর কারূন, ফেরাউন ও হামানকে আমি ধ্বংস করি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসে কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে অথচ তারা অগ্রগমনকারী ছিল না।[৬৭] শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে আমি তার গোনাহের জন্য পাকড়াও করি। তারপর তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর আমি পাথর বর্ষণকারী বাতাস প্রবাহিত করি[৬৮] এবং কাউকে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আঘাত হানে[৬৯] আবার কাউকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করি[৭০] এবং কাউকে ডুবিয়ে দিই।[৭১] আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছিল।[৭২]

৬২. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আখেরাতের আগমন কামনা করো। একথা মনে করো না, যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই এবং এরপর আর এমন কোন জীবন নেই যেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ–কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং তার পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করো যার ফলে তোমরা আখেরাতে ভালো পরিণতি লাভের আশা করতে পারো।

৬৩. অর্থাৎ একথা স্বীকার করলো না যে, আল্লাহর রসূল হযরত শু'আইব (আ), যে শিক্ষা তিনি দিচ্ছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একে না মানলে তাদেরকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

৬৪. ঘর বলতে এখানে এই জাতি যে এলাকায় বসবাস করতো সেই সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যখন পুরোপুরি একটি জাতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে তখন তার দেশই তার ঘর হতে পারে।

৬৫. আরবের যেসব এলাকায় এ দু'টি জাতির বসতি ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও তা জানতো। দক্ষিণ আরবের যেসব এলাকা বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদ্রা মাউত নামে পরিচিত প্রাচীনকালে সে এলাকাগুলোতে ছিল আদ জাতির বাস। আরবের লোকেরা একথা জানতো। হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত এবং মদীনা ও

খায়বর থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজো সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কুরআন নাযিল হবার যুগে এ ধ্বংসাবশেষগুলোর অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরো কিছু বেশী সুস্পষ্ট থেকে থাকবে।

৬৬. অর্থাৎ অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল না। তারা ছিল তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ সুসভ্য ও প্রগতিশীল লোক। নিজেদের দুনিয়ার কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যাপারে তারা পূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতো। তাই একথা বলা যাবে না যে, শয়তান তাদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়ে এবং বুদ্ধি বিনষ্ট করে দিয়ে নিজের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও খোলা চোখে শয়তান যে পথ দেখিয়েছিল এবং যে পথে তারা বড়ই লাভ ও ভোগের সন্ধান পেয়েছিল সে পথে পাড়ি জমিয়েছিল এবং এমন পথ পরিহার করেছিল যা তাদের কাছে নীরস, বিস্বাদ এবং নৈতিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হবার কারণে কষ্টকর মনে হচ্ছিল।

৬৭. অর্থাৎ পালিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহর কৌশল ব্যর্থ করে দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

৬৮. অর্থাৎ আদ জাতি। তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ভয়াবহ তুফান চলতে থাকে। (সূরা আল হাক্কাহ, ৭ আয়াত)

৬৯. অর্থাৎ সামূদ।

৭০. অর্থাৎ কারূন।

৭১. ফেরাউন ও হামান।

৭২. এ পর্যন্ত যেসব কাহিনী শুনানো হলো সেগুলোর বক্তব্যের লক্ষ ছিল দু'টি। একদিকে এগুলো মু'মিনদেরকে শোনানো হয়েছে, যাতে তারা হিম্মতহারা, ভগ্ন হৃদয় ও হতাশ না হয়ে পড়ে এবং বিপদ ও সংকটের কঠিন আবর্তেও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা সহকারে সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখে এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই এসে যাবে, তিনি জালেমদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং সত্যের ঝাণ্ডা উঁচু করে দেবেন। অন্যদিকে এগুলো এমন জালেমদেরকেও শুনানো হয়েছে যারা তাদের ধারণা মতে ইসলামী আন্দোলনকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল।-তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সংযম ও সহিষ্ণুতার ভুল অর্থ গ্রহণ করছো। তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে একটি অরাজক রাজত্ব মনে করেছো। তোমাদের যদি এখন পর্যন্ত বিদ্রোহ, সীমালংঘন, জুলুম, নিপীড়ন ও অসৎকাজের জন্য পাকড়াও না করা হয়ে থাকে এবং সংশোধিত হবার জন্য অনুগ্রহ করে দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিজে নিজেই একথা মনে করে বসো না যে, এখানে আদতে কোন ইনসাফকারী শক্তিই নেই এবং এ ভূখণ্ডে লাগামহীনভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত যাচ্ছে তাই করে যেতে পারবে। এ বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে এমন-পরিণতির সম্মুখীন করবেই ইতিপূর্বে নূহের জাতি, লূতের জাতি ও শু'আইবের জাতি যার সম্মুখীন হয়েছিল, আদ ও সামূদ জাতিকে যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং কারূন ও ফেরাউন যে পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সা। সে নিজের একটি ঘর তৈরি করে এবং সব ঘরের চেয়ে বেশী দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর। হায় যদি এরা জানতো।[৭৩]

৭৩. ওপরে যতগুলো জাতির কথা বলা হয়েছে তারা সবাই শির্কে লিপ্ত ছিল। নিজেদের উপাস্যের ব্যাপারে তাদের আকীদা ছিল ঃ এরা আমাদের সহায়ক সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক (Guardians) এরা আমাদের ভাগ্য ভাংগা গড়ার ক্ষমতা রাখে। এদের পূজা করে এবং এদেরকে মানত ও নজরানা পেশ করে যখন আমরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবো তখন এরা আমাদের কাজ করে দেবে এবং সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে। কিন্তু যেমন ওপরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে দেখানো হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাদের ধ্বংসের ফায়সালা করা হয় তখন তাদের উপরোল্লিখিত সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। সে সময় তারা যেসব দেব-দেবী, অবতার, অলী, আত্মা, জিন বা ফেরেশ্‌তাদের পূজা করতো তাদের একজনও তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এবং নিজেদের মিথ্যা আশার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তারা মাটির সাথে মিশে গেছে। এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর এখন মহান আল্লাহ মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাকে বাদ দিয়ে একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে যে আশার আকাশ কুসুম তোমরা রচনা করেছো তার প্রকৃত অবস্থা মাকড়শার জালের চাইতে বেশী কিছু নয়। মাকড়শার জাল যেমন আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশ্‌ত করতে পারে না, তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা যে কল্পনা বিলাসের এমন এক চক্করের মধ্যে পড়ে আছো, এটা নিছক তোমাদের মূর্খতার কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের যদি সামান্যতম জ্ঞানও তোমাদের থাকতো, তাহলে তোমরা এসব ভিত্তিহীন সহায় ও নির্ভরের ওপর কখনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না। সত্য কেবলমাত্র এতটুকুই, এ বিশ্ব-জাহানে ক্ষমতার মালিক একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কেউ নেই এবং একমাত্র তাঁরই ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালোভাবেই জানেন এবং তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।[৭৪] মানুষকে উপদেশ দেবার জন্য আমি এ দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছি কিন্তু এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞান সম্পন্ন। আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্য-ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন,[৭৫] প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৭৬]

"যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" (আল বাকারাহ, ২৫৬ আয়াত)

৭৪. অর্থাৎ যেসব জিনিসকে এরা মাবুদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সহায্যের জন্য আহবান করে তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তাঁরই বিচক্ষণ কর্মকুশলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে।

এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে, "আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন) এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রম ও জ্ঞানের অধিকারী।

৭৫. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনাই নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যে ইমারতই দাঁড় করানো হবে তা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্যের সাথে সংঘাত বাধিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ্ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহ্ই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۟

৫ রুকূ'

(হে নবী!) তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো,[৭৭] নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৭৮] আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতেও বড় জিনিস।[৭৯] আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো।

বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত–অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতমও পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

৭৬. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির মধ্যে তাওহীদের সত্যতা এবং শির্‌ক ও নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা হবার ওপর একটি পরিষ্কার সাক্ষ–প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ সাক্ষ প্রমাণের সন্ধান একমাত্র তারাই পায় যারা নবীগণের শিক্ষা মেনে নেয়। নবীগণের শিক্ষা অস্বীকারকারীরা সবকিছু দেখার পরও কিছুই দেখে না।

৭৭. আপাত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ করেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের ওপর সে সময় যেসব জুলুম–নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল সে সবের মোকাবিলা করার জন্য পিছনের চার রুকূ'তে অনবরত সবর, দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার উপদেশ দেবার পর এখন তাদেরকে বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু'টি জিনিসই মু'মিনকে, এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা এবং দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝনঝার মোকাবিলায় শুধু মাত্র টিকে থাকতে নয় বরং তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযের মাধ্যমে এ শক্তি মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে যখন সে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার শিক্ষাগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেগুলোকে সঞ্চারিত করে যেতে থাকে এবং তার নামায কেবলমাত্র শারীরিক কসরতের

মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং চরিত্র ও কর্মের সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়। সামনের দিকের বক্তব্যে কুরআন মজীদ নিজেই নামাযের কাংখিত গুণ বর্ণনা করছে। আর কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে এতটুকু জানা দরকার-যে, মানুষের কন্ঠনালী অতিক্রম করে তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তেলাওয়াত আঘাত হানতে পারে না তা তাকে কুফরীর বন্যা প্রবাহের মোকাবিলায় শক্তি তো দূরের কথা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিও দান করতে পারে না। যেমন হাদীসে একটি দল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يقرأون القران ولا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية

"তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কন্ঠনালীর নীচে নামবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।" (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

আসলে যে তেলাওয়াতের পরে মানুষের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র-কর্মনীতিতেও কোন পরিবর্তন আসে না বরং কুরআন পড়ার পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করে যেতে থাকে তা একজন মু'মিনের কুরআন তেলাওয়াত হতেই পারে না। এ সম্পর্কে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম পরিষ্কার বলেন ঃ ما امن بالقران من استحل محارمه "কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।" (তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছে হযরত সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে) এ ধরনের তেলাওয়াত মানুষের আত্মিক সংশোধন এবং তার আত্মায় শক্তি সঞ্চার করার পরিবর্তে তাকে আল্লাহর মোকাবিলায় আরো বেশী বিদ্রোহী এবং নিজের বিবেকের মোকাবিলায় আরো বেশী নির্লজ্জ করে তোলে। এ অবস্থায় তার মধ্যে চরিত্র বলে কোন জিনিসেরই আর অস্তিত্ব থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নেয়, তা পাঠ করে তার মধ্যে আল্লাহ তাকে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানতেও থাকে এবং তারপর তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যেতে থাকে, তার ব্যাপারটা তো দাঁড়ায় এমন একজন অপরাধীর মতো যে আইন না জানার কারণে নয় বরং আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর অপরাধমূলক কাজ করে। এ অবস্থাটিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঃ القران حجة لك او عليك "কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।" (মুসলিম) অর্থাৎ যদি কুরআনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা হয় তাহলে তা তোমার জন্য সাক্ষ ও প্রমাণ হবে। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যেখানেই তোমাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে সেখানেই তুমি নিজের সাফাই হিসেবে কুরআনকে পেশ করতে পারবে। অর্থাৎ তুমি বলতে পারবে, আমি যা কিছু করেছি এ কিতাব অনুযায়ী করেছি। যদি তোমার কাজ যথার্থই কুরআন অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ইসলামের কোন বিচারক তোমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানেও তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যদি এ কিতাব তোমার কাছে পৌঁছে গিয়ে থাকে এবং তা পড়ে তুমি জেনে নিয়ে থাকো তোমার রব তোমাকে কি বলতে চান, তোমাকে কোন্ কাজের হুকুম দেন, কোন্ কাজ

করতে নিষেধ করেন এবং আবার তুমি তার বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করো, তাহলে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহর অদালতে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাকে আরো বেশী জোরদার করে দেবে। এরপর না জানার ওজর পেশ করে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অথবা হাল্‌কা শাস্তি লাভ করা তোমার জন্য সম্ভব হবে না।

৭৮. নামাযের বহু গুণের মধ্যে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিকে সুস্পষ্ট করে এখানে পেশ করা হয়েছে। মক্কার বিরুদ্ধ পরিবেশে মুসলমানরা যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মোকাবিলা করার জন্য তাদের বস্তুগত শক্তির চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিল নৈতিক শক্তির। এ নৈতিক শক্তির উদ্ভব ও তার বিকাশ সাধনের জন্য প্রথমে দু'টি ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয়টি নামায কায়েম করা। এরপর এখন এখানে বলা হচ্ছে, নামায কায়েম করা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে তোমরা এমনসব দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারো ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেগুলোতে তোমরা নিজেরাই লিপ্ত ছিলে এবং যেগুলোতে বর্তমানে লিপ্ত আছে তোমাদের চারপাশের আরবীয় ও অনারবীয় জাহেলী সমাজ।

এ পর্যায়ে নামাযের এই বিশেষ উপকারিতার কথা বলা হয়েছে কেন, একটু চিন্তা করলে একথা অতি সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, নৈতিক দুষ্কৃতিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী লোকেরা এর মাধ্যমে কেবলমাত্র দুনিয়ায় ও আখেরাতেই লাভবান হয় না বরং এর ফলে তারা অনিবার্যভাবে এমন সব লোকদের ওপর ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যারা নানান নৈতিক দুষ্কৃতির শিকার হয়ে গেছে এবং এসব দুষ্কৃতির লালনকারী জাহেলিয়াতের পূতিগন্ধময় অপবিত্র ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অশ্লীল ও অসৎকাজ বলতে যেসব দুষ্কৃতি বুঝায় মানুষের প্রকৃতি সেগুলোকে খারাপ বলে জানে এবং সবসময় সকল জাতি ও সকল সমাজের লোকেরা, কার্যত তারা যতই বিপথগামী হোক না কেন, নীতিগতভাবে সেগুলোকে খারাপই মনে করে এসেছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবের সমাজ মানসও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সে সমাজের লোকেরাও নৈতিকতার পরিচিত দোষ–গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা অসৎকাজের মোকাবিলায় সৎকাজের মূল্য জানতো। কদাচিত হয়তো এমন কোন লোকও তাদের মধ্যে থেকে থাকবে যে অসৎকাজকে ভালো কাজ মনে করে থাকবে এবং ভালো কাজকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকবে। এ অবস্থায় এ বিকৃত সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন আন্দোলন সৃষ্টি হয় যার সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই নৈতিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নিজেদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নিজেদের সমকালীন লোকদের থেকে সুস্পষ্ট উন্নতি লাভ করে, তাহলে অবশ্যই সে তার প্রভাব বিস্তার না করে থাকতে পারে না। এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না যে, আরবের সাধারণ লোকেরা অসৎকাজ নির্মূলকারী এবং সৎ ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন মানুষ গঠনকারী এ আন্দোলনের নৈতিক প্রভাব মোটেই অনুভব করবে না এবং এর মোকাবিলায় নিছক জাহেলিয়াত প্রীতির অন্তসারশূন্য শ্লোগানের ভিত্তিতে এমনসব লোকদের সাথে সহযোগিতা করে যেতে থাকবে যারা নিজেরাই নৈতিক

দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল এবং জাহেলিয়াতের যে ব্যবস্থা শত শত বছর থেকে সে দুষ্কৃতিগুলো লালন করে চলছিল তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। এ কারণেই কুরআন এ অবস্থায় মুসলমানদের বস্তুগত উপকরণাদি ও শক্তিমত্তা সংগ্রহ করার পরামর্শ দেবার পরিবর্তে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের এ দলটি এমন চারিত্রিক শক্তির অধিকারী হবে যার ফলে তারা মানুষের মন জয় করে ফেলবে এবং তীর ও তরবারির সাহায্য ছাড়াই শত্রুকে পরাজিত করবে।

এ আয়াতে নামাযের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দু'টি দিক রয়েছে। একটি তার অনিবার্য গুণ। অর্থাৎ সে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর দ্বিতীয়টি তার কাংখিত গুণ। অর্থাৎ নামায আদায়কারী কার্যক্ষেত্রে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুক। বিরত রাখার ব্যাপারে বলা যায়, নামায অবশ্যই এ কাজ করে। যে ব্যক্তিই নামাযের ধরনের ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করবে সে-ই স্বীকার করবে, মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যত ধরনের ব্রেক লাগানো সম্ভব তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ব্রেক নামাযই হতে পারে। এরচেয়ে বড় প্রভাবশালী নিরোধক আর কী হতে পারে যে, মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আহবান করা হবে এবং তার মনে একথা জাগিয়ে দেয়া হবে যে, তুমি এ দুনিয়ায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও বরং এক আল্লাহর বান্দা এবং তোমার আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি তোমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ এমনকি তোমার মনের ইচ্ছা ও সংকল্পও জানেন এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের যাবতীয় কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তারপর কেবলমাত্র একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকলে চলবে না বরং কার্যত প্রত্যেক নামাযের সময় যাতে লুকিয়ে লুকিয়েও সে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য না করে তার অনুশীলনও করতে হবে। নামাযের জন্য ওঠার পর থেকে শুরু করে নামায খতম করা পর্যন্ত মানুষকে অনবরত এমনসব কাজ করতে হয় যেগুলো করার সময় সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করছে একথা সে এবং তার আল্লাহ ছাড়া তৃতীয় কোন সত্তা জানতে পারে না। যেমন, যদি করো অযু ভেঙ্গে গিয়ে থাকে এবং সে নামায পড়তে দাঁড়ায়, তাহলে তার যে অযু নেই একথা সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে-ই বা জানতে পারবে। মানুষ যদি নামাযের নিয়তই না করে এবং বাহ্যত রুকূ', সিজদা ও উঠা-বসা করে নামাজের সূরা-কেরাত, দোয়া-দরূদ ইত্যাদি পড়ার পরিবর্তে নিরবে গজল পড়তে থাকে তাহলে সে যে আসলে নামায পড়েনি সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে? এ সত্ত্বেও যখন মানুষ শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন থেকে শুরু করে নামাযের আরকান ও সূরা-কেরাত-দোয়া-দরূদ পর্যন্ত সবকিছু সম্পন্ন করে আল্লাহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ে তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ নামাযের মাধ্যমে প্রতিদিন কয়েকবার তার বিবেকে প্রাণ সঞ্চার করা হচ্ছে, তার মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাকে দায়িত্বশীল মানুষে পরিণত করা হচ্ছে এবং যে আইনের প্রতি সে ঈমান এনেছে তা মেনে চলার জন্য বাইরে কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং বিশ্ববাসী তার কাজের অবস্থা জানুক বা না জানুক নিজের আনুগত্য প্রবণতার প্রভাবাধীনে গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল অবস্থায় সে সেই আইন মেনে চলবে—কার্যত তাকে এরি অনুশীলন করানো হচ্ছে।

এ দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না যে, নামায কেবলমাত্র মানুষকে অশ্লীল ও অসৎকাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং আসলে দুনিয়ায় দ্বিতীয় এমন কোন অনুশীলন পদ্ধতি নেই যা মানুষকে দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এত বেশী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষ নিয়মিত নামায পড়ার পর কার্যতও দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকে কি না। জবাবে বলা যায়, এটা নির্ভর করে যে ব্যক্তি আত্মিক সংশোধন ও পরিশুদ্ধির অনুশীলন করছে তার ওপর। সে যদি এ থেকে উপকৃত হবার সংকল্প করে এবং এ জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে নামাযের সংশোধনমূলক প্রভাব তার ওপর পড়বে। অন্যথায় দুনিয়ার কোন সংশোধন ব্যবস্থা এমন ব্যক্তির ওপর কার্যকর হতে পারে না যে তার প্রভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুতই নয় অথবা জেনে বুঝে তার প্রভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। এর দৃষ্টান্ত যেমন দেহের পরিপুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি হচ্ছে খাদ্যের অনিবার্য বিশেষত্ব। কিন্তু এ ফল তখনই লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে যখন মানুষ তাকে শরীরের অংশে পরিণত হবার সুযোগ দেবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যেক বারে খাবার পরে বমি করে সমস্ত খাবার বের করে দিতে থাকে তাহলে এ ধরনের আহার তার জন্য মোটেই উপকারী হতে পারে না। এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখিয়ে যেমন একথা বলা চলে না যে, খাদ্য দ্বারা দেহের পরিপুষ্টি হয় না। কারণ, দেখা যাচ্ছে অমুক ব্যক্তি আহার করার পরও শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে এমন একজন নামাযী যে অসৎকাজ করে যেতেই থাকে, তার দৃষ্টান্ত পেশ করেও একথা বলা যেতে পারে না যে, নামায অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে না। কারণ, ওমুক ব্যক্তি নামায পড়ার পরও খারাপ কাজ করে। এ ধরনের নামাযী সম্পর্কে তো একথা বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত হবে যে, সে আসলে নামায পড়ে না যেমন যে ব্যক্তি আহার করে বমি করে তার সম্পর্কে একথা বলা বেশী যুক্তিযুক্ত যে, সে আসলে আহার করে না।

ঠিক একথাই বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له "যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তার নামাযই হয়নি।" (ইবনে আবী হাতেম) ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে,

من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا

"যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তাকে তার নামায আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে।" (ইবনে আবী হাতেম ও তাবারানী)

হাসান বাসরী (র) একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসাল রেওয়ায়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর ও বাইহাকী) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে নবী করীমের (সা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

আর[৮০] উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না[৮১] তবে তাদের মধ্যে যারা জালেম[৮২] তাদেরকে বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী।[৮৩]

لا صلوة لمن لم يطع الصلوة وطاعة الصلوة ان تنهى عن الفحشاء والمنكر

"যে ব্যক্তি নামাযের আনুগত্য করেনি তার নামাযই হয়নি আর নামাযের আনুগত্য হচ্ছে, মানুষ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।" (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)

একই বক্তব্য সম্বলিত একাধিক উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, কাতাদাহ, আ'মাশ ও আরো অনেকের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম জাফর সাদেক বলেন, যে ব্যক্তি তার নামায কবুল হয়েছে কিনা একথা জানতে চায় তার দেখা উচিত তার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে কি পরিমাণ বিরত রেখেছে। যদি নামাযের বাধা দেবার পর সে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে থাকে, তাহলে তার নামায কবুল হয়ে গেছে। (রূহুল মা'আনী)

৭৯. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহর যিকির (অর্থাৎ নামায) এর চেয়ে বড়। এর প্রভাব কেবল নেতিবাচকই নয়। শুধুমাত্র অসৎকাজ থেকে বিরত রেখেই সে ক্ষান্ত থাকে না। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে সে সৎকাজে উৎসাহিত এবং সুকৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার জন্য মানুষকে উদ্যোগী করে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ নিজেই অনেক বড় জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের কোন কাজ এর চেয়ে বেশী ভালো নয়। এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহর তোমাকে স্মরণ করা অনেক বেশী বড় জিনিস। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন : فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো।" (আল বাকারাহ ১৫২ আয়াত) কাজেই বান্দা যখন নামাযে আল্লাহকে স্মরণ করবে তখন অবশ্যই আল্লাহও তাকে স্মরণ করবেন। আর বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার তুলনায় আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা অনেক বেশী উচ্চমানের। এ তিনটি অর্থ ছাড়া আরো একটি

সূক্ষ্ম অর্থও এখানে হয়। হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিতা স্ত্রী এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর স্মরণ নামায পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সীমানা এর চাইতেও বহুদূর বিস্তৃত। যখন মানুষ রোযা রাখে, যাকাত দেয় বা অন্য কোন সৎকাজ করে তখন অবশ্যই সে আল্লাহকে স্মরণই করে, তবেই তো তার দ্বারা ঐ সৎকাজটি সম্পাদিত হয়। অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি কোন অসৎকাজ করার সুযোগ পাওয়ার পর তা থেকে দূরে থাকে তখন এটাও হয় আল্লাহর স্মরণেরই ফল। এ জন্য আল্লাহর স্মরণ একজন মু'মিনের সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়।

৮০. উল্লেখ্য, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সূরায় হিজরাত করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সে সময় হাব্শাই ছিল মুসলমানদের পক্ষে হিজরাত করে যাবার জন্য একমাত্র নিরাপদ জায়গা। আর হাবশায় সে সময় ছিল খৃষ্টানদের প্রাধান্য। তাই আহলে কিতাবের মুখোমুখি হলে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন্ ধরনের ও কিভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে আয়াতগুলোতে সেসব উপদেশ দেয়া হয়েছে।

৮১. অর্থাৎ বিতর্ক ও আলাপ–আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি–প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় এবং বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্যকথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। একজন পাহ্লোয়ানের মতো তার লড়াই করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্যই হয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়া। বরং একজন ডাক্তারের মতো তাকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, যিনি তার রোগীর চিকিৎসা করার সময় একথাকে গুরুত্ব দেন যে, তাঁর নিজের কোন ভুলের দরুন রোগীর রোগ যেন আরো বেশী বেড়ে না যায় এবং সর্বাধিক কম কষ্ট সহ্য করে যাতে তাঁর রোগীর রোগ নিরাময় হওয়া সম্ভব হয় এ জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক–আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে আহ্লি কিতাবদের জন্য নয় বরং দীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

"আহবান করো নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক–আলোচনা করো।" (আন নাহল, ১২৫)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

"সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। তুমি দেখবে এমন এক ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেমন তোমার অন্তরংগ বন্ধু।" (হা–মীম আস্ সাজদাহ, ৩৪)

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

"তুমি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করো। আমি জানি (তোমার বিরুদ্ধে) তারা যেসব কিছু তৈরি করে।" (আল মু'মিনূন, ৯৬)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ -

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান তোমাকে উস্কানী দেয় তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও।" (আল আ'রাফ, ১৯৯–২০০)

৮২. অর্থাৎ যারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের জুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মোকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে চলবে না। যেন মানুষ সত্যের আহবায়কের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদিতার শিক্ষা দেয় কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয় না। তাদেরকে প্রত্যেক জালেমের জুলুমের সহজ শিকারে পরিণত হবার শিক্ষা দেয় না।

৮৩. এ বাক্যগুলোতে মহান আল্লাহ নিজেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বিতর্ক–আলোচনার পথ–নির্দেশ দিয়েছেন। সত্য প্রচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাদের এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এখানে শেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিতর্ক করতে হবে তার ভ্রষ্টতাকে আলোচনার সূচনা বিন্দুতে পরিণত করো না। বরং সত্য ও ন্যায়–নীতির যে অংশগুলো তোমার ও তার মধ্যে সমভাবে বিরাজ করছে সেগুলো থেকে আলোচনা শুরু করো। অর্থাৎ বিরোধীয় বিন্দু থেকে আলোচনা শুরু না করে ঐক্যের বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে। তারপর সেই সর্বসম্মত বিষয়াবলী থেকে যুক্তি পেশ করে শ্রোতাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে যে, তোমার ও তার মধ্যে যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোতে তোমার অভিমত সর্বসম্মত ভিত্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং তার অভিমত হচ্ছে তার বিপরীতধর্মী।

এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, আহ্‌লি কিতাব আরবের মুশরিকদের মতো অহী, রিসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারী ছিল না। বরং তারা মুসলমানদের মতো এ সত্যগুলো স্বীকার করতো। এ মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করার পর যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধের বড় কোন ভিত্তি হতে পারতো তাহলে তা হতো এই যে, তাদের কাছে যেসব আসমানী কিতাব এসেছে মুসলমানরা সেগুলো মানছে না এবং মুসলমানদের নিজেদের কাছে যে আসমানী কিতাব এসেছে তাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে আর তা গ্রহণ না করলে তাদেরকে কাফের গণ্য করছে। বিরোধের জন্য এটি খুবই শক্তিশালী ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থান ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আহলি কিতাবের কাছে যেসব কিতাব ছিল সেসবকেই তারা সত্য বলে মানতো এবং এ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۖ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

(হে নবী) আমি এভাবেই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি,[৮৪] এ জন্য যাদেরকে আমি প্রথমে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে[৮৫] এবং এদের অনেকেও এতে বিশ্বাস করছে[৮৬] আর আমার আয়াত একমাত্র কাফেররাই অস্বীকার করে।[৮৭]

সংগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছিল তার প্রতি তারা ঈমান এনেছিল। এরপর কোন্ যুক্তিসংগত কারণে আহলি কিতাব এক আল্লাহরই নাযিল করা একটি কিতাব মানে এবং অন্যটি মানে না একথা বলার দায়িত্ব ছিল তাদের নিজেদেরই। এ জন্য আল্লাহ এখানে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখনই আহলি কিতাবদের মুখোমুখি হবে সবার আগে তাদের কাছে ইতিবাচকভাবে নিজেদের এ অবস্থানটি তুলে ধরো। তাদেরকে বলো, তোমরা যে আল্লাহকে মানো আমরাও তাঁকেই মানি এবং আমরা তাঁর হুকুম পালন করি। তাঁর পক্ষ থেকে যে বিধান, নির্দেশ ও শিক্ষাবলীই এসেছে, তা তোমাদের ওখানে বা আমাদের এখানে যেখানেই আসুক না কেন, সেসবের সামনে আমরা মাথা নত করে দেই। আমরা তো হুকুমের দাস। দেশ, জাতি ও বংশের দাস নই। আল্লাহর হুকুম এক জায়গায় এলে আমরা মেনে নেবো এবং এই একই আল্লাহর হুকুম অন্য জায়গায় এলে আমরা তা মানবো না, এটা আমাদের রীতি নয়। একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বার বার বলা হয়েছে। বিশেষ করে আহলি কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তো জোর দিয়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন, সূরা আল বাকারার ৪, ১৩৬, ১৭৭; আলে ইমরানের ৮৪; আন্ নিসার ১৩৬, ১৫০–১৫২, ১৬২–১৬৪ এবং আশ্ শূরার ১৩ আয়াত।

৮৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি আমি কিতাব নাযিল করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। দুই, আমি এই শিক্ষা সহকারেই একে নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলো সব স্বীকার করে নিয়েই একে মানতে হবে।

৮৫. পূর্বাপর বিষয়বস্তু নিজেই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে সমস্ত আহলি কিতাবের কথা বলা হয়নি। বরং এমন সব আহলি কিতাবের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যারা কেবলমাত্র এ কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জীবের মতো নিছক কিতাবের বোঝা বহন করে বেড়াতেন না বরং প্রকৃত অর্থেই ছিলেন কিতাবধারী। তাদের সামনে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে সত্যায়িত করে এ শেষ কিতাবটি এলো তখন তারা কোন

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

(হে নবী) ইতিপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতে।[৮৮] আসলে এগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নিদর্শন এমন লোকদের মনের মধ্যে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[৮৯] এবং জালেমরা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না।

প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতির আশ্রয় নিলেন না এবং তাকেও ঠিক তেমনি আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করে নিলেন যেমন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে স্বীকার করতেন।

৮৬. "এদের" শব্দের মাধ্যমে আরববাসীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সত্যপ্রিয় লোকেরা, তারা আহলি কিতাব বা অ–আহলি কিতাব যারাই হোক না কেন, সর্বত্রই এর প্রতি ঈমান আনছে।

৮৭. এখানে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে যারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতি ত্যাগ করে সত্য কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অথবা যারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা ও অবাধ স্বাধীনতার ওপর বিধি–নিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে পিছটান দেয় এবং এরি ভিত্তিতে সত্য অস্বীকার করে।

৮৮. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে একটি যুক্তি। ইতিপূর্বে সূরা ইউনুস ও সূরা কাসাসে এ যুক্তি আলোচিত হয়েছে (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ২১ টীকা এবং সূরা কাসাস, ৬৪ ও ১০৯ টীকা। এ বিষয়বস্তুর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা নাহল, ১০৭; বনী ইসরাঈল, ১০৫; আল মু'মিনূন, ৬৬; আল ফুরকান, ১২ এবং আশ্ শূরা, ৮৪ টীকাগুলো অধ্যয়নও সহায়ক হবে)।

এ আয়াতে যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর স্বদেশবাসী ও আত্মীয়–বান্ধবগণ, যাদের মধ্যে তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন, সবাই ভালোভাবে জানতো তিনি সারা জীবন কখনো কোন বই পড়েননি এবং কলম হাতে ধরেননি। এ সত্য ঘটনাটি পেশ করে মহান আল্লাহ বলছেন, এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাবলী, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম ও দীনের আকীদা–বিশ্বাস, প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিক জীবন যাপনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে যে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ এ নিরক্ষর নবীর কণ্ঠ থেকে হচ্ছে তা তিনি অহী ছাড়া অন্য

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

এরা বলে, "কেনই বা এই ব্যক্তির ওপর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হয়নি[৯০] এর রবের পক্ষ থেকে?" বলো, "নিদর্শনাবলী তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি কেবলমাত্র পরিষ্কারভাবে সতর্ককারী।" আর এদের জন্য কি এ (নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়?[৯১] আসলে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসিহত।[৯২]

কোন উপায়ে অর্জন করতে পারতেন না। যদি তিনি লেখাপড়া জেনে থাকতেন এবং লোকেরা কখনো তাঁকে বই পড়তে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে দেখতো তাহলে তো অবশ্যই বাতিলপন্থীদের জন্য এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন ভিত্তি থাকতো যে, এসব জ্ঞান অহীর মাধ্যমে নয় বরং জাগতিক মেধা, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা তো তাঁর সম্পর্কে নামমাত্র কোন সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ ও ভিত্তিও অবশিষ্ট রাখেনি। এখন নিছক হঠকারিতা ছাড়া তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করার আর এমন কোন কারণই নেই যাকে কোন পর্যায়েও যুক্তিসঙ্গত বলা যেতে পারে।

৮৯. অর্থাৎ একজন নিরক্ষরের পক্ষে কুরআনের মতো একটি কিতাব পেশ করা এবং সহসা এমনসব অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটানো যেগুলোর জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ আয়োজন কখনো কারো চোখে পড়েনি, এগুলোই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ পেশকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন। দুনিয়ার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে যারই অবস্থা পর্যালোচনা করা যাবে, তারই নিজস্ব পরিবেশে মানুষ এমনসব উপাদানের সন্ধান লাভ করতে পারবে যেগুলো তার ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানের মধ্যে একটা পরিষ্কার সম্পর্ক পাওয়া যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে যেসব বিস্ময়কর গুণাবলী ও কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল তার কোন উৎস তাঁর পরিবেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানের সাথে কোন প্রকার দূরবর্তী সম্পর্ক রাখে এমনসব উপাদান সেকালে আরবীয় সমাজের এবং আশপাশে যেসব দেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিল তাদের সমাজের কোথাও থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এ বাস্তবতার ভিত্তিতেই এখানে বলা

হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা একটি নিদর্শনের নয় বরং বহু নিদর্শনের সমষ্টি। মূর্খ এর মধ্যে কোন নিদর্শন দেখতে পায় না, এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু জ্ঞানীরা এ নিদর্শনগুলো দেখে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কেবলমাত্র একজন নবীই এ কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন।

৯০. অর্থাৎ মু'জিযা, যেগুলো দেখে বিশ্বাস করা যায় সত্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নবী।

৯১. অর্থাৎ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি কুরআনের মতো একটি কিতাব নাযিল হওয়া, এটি তোমাদের রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট হবার মতো বড় মু'জিযা নয় কি? এর পরও কি আর কোন মু'জিযার প্রয়োজন থাকে? অন্য মু'জিযাগুলোতো যারা দেখেছে তাদের জন্য মু'জিযা ছিল কিন্তু এ মু'জিযাটি তো সর্বক্ষণ তোমাদের সামনে রয়েছে, প্রতিদিন তোমাদের পড়ে শুনানো হচ্ছে। তোমরা সবসময় তা দেখতে পারো।

কুরআন মজীদের এ যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পরও যারা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষর প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদের দুঃসাহস দেখে অবাক হতে হয়। অথচ এখানে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় নবী করীমের (সা) নিরক্ষর হবার বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে পেশ করছে। যেসব হাদীসের ভিত্তিতে নবী করীম (সা) সাক্ষর ছিলেন অথবা পরে লেখাপড়া শিখেছিলেন বলে দাবী করা হয়, সেগুলো তো প্রথম দৃষ্টিতেই প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। কারণ কুরআন বিরোধী কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তারপর এগুলো নিজেই এত দুর্বল যে, এগুলোর ওপর কোন যুক্তির ভিত্ খাড়া করা যেতে পারে না। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বুখারীর একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে : হুদাইবিয়ার চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় যখন চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধিরা রসূলে করীমের (সা) নামের সাথে রসূলুল্লাহ লেখার ওপর আপত্তি জানায়। তখন নবী (সা) চুক্তি লেখককে (অর্থাৎ হযরত আলী) নির্দেশ দেন, ঠিক আছে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে তার জায়গায় লেখো 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ'। হযরত আলী (রা) 'রসূলুল্লাহ' শব্দ কেটে দিতে অস্বীকার করেন। নবী করীম (সা) তাঁর হাত থেকে কলম নিয়ে নিজেই শব্দটি কেটে দেন এবং 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখে দেন।

কিন্তু এ হাদীসটি বারাআ ইবনে আযিব থেকে বুখারীতে চার জায়গায় এবং মুসলিমে দু'জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর শব্দাবলী বিভিন্ন।

এক : বুখারী চুক্তি অধ্যায়ে এর শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

قال لعلى امحه فقال على ما انا بالذى امحاه فمحاه رسول الله بيده –

"নবী করীম (সা) আলীকে বললেন এ শব্দগুলো কেটে দাও। আলী বললেন, আমি তো কেটে দিতে পারি না। শেষে নবী করীম (সা) নিজ হাতে তা কেটে দেন।"

দুই : এ কিতাবে অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে :

ثم قال لعلى امح رسول الله قال لا والله لا امحوك ابدا فاخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله

"তারপর আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দ কেটে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো আপনার নাম কাটবো না। শেষে নবী করীম (সা) দলীলটি নিয়ে লিখলেন, "এটি সেই চুক্তি যা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্পাদন করেছেন।"

তিন : তৃতীয় হাদীসও বারাআ ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম বুখারী এটি জিযিয়া অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন :

وكان لا يكتب فقال لعلى امح رسول الله فقال على والله لا امحاه ابدا قال فارنيه قال فاراه اياه فمحاه النبى صلى الله عليه وسلم بيده -

"নবী করীম (সা) নিজে লিখতে পারতেন না। তিনি হযরত আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহটা কেটে দাও। আলী বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এ শব্দগুলো কখনোই কাটবো না। একথায় নবী করীম (সা) বলেন, যেখানে এ শব্দগুলো লেখা আছে সে জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তিনি তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে সে শব্দগুলো কেটে দিলেন।

চার : চতুর্থ হাদীসটি বুখারীর যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায়ে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله

"কাজেই নবী করীম (সা) সে দলীলটি নিয়ে নিলেন অথচ তিনি লিখতে জানতেন না এবং তিনি লিখলেন। এটি সেই চুক্তি যেটি স্থির করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।"

পাঁচ : একই বর্ণনাকারী বারাআ ইবনে আযিব থেকে মুসলিমের কিতাবুল জিহাদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, নবী করীম (সা) আলীর অস্বীকৃতির কারণে নিজের হাতে "আল্লাহর রসূল" শব্দ কেটে দেন।

ছয় : এ কিতাবে অন্য একটি হাদীস একই বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে বলেন, রসূলুল্লাহ শব্দ কোথায় লেখা আছে আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি সেটি বিলুপ্ত করে আবদুল্লাহর পুত্র লিখে দেন।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

৬ রুকূ'

(হে নবী!) বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে সবকিছু জানেন। যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

এরা তোমার কাছে দাবী করছে আযাব দ্রুত আনার জন্য।[৯৩] *যদি একটি সময় নির্ধারিত না করে দেয়া হতো, তাহলে তাদের ওপর আযাব এসেই যেতো এবং নিশ্চিতভাবেই (ঠিক সময় মতো) তা অকস্মাত এমন অবস্থায় এসে যাবেই যখন তারা জানতেও পারবে না। এরা তোমার কাছে আযাব দ্রুত আনার দাবী করছে অথচ জাহান্নাম এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে নিয়েছে (এবং এরা জানতে পারবে) সেদিন যখন আযাব এদেরকে ওপর থেকে ঢেকে ফেলবে এবং পায়ের নিচে থেকেও আর বলবে, যেসব কাজ তোমরা করতে এবার তার মজা বোঝো।*

উল্লেখিত হাদীসগুলোর বর্ণনার মধ্যে যে অস্থিরতা ফুটে উঠেছে তা পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, মাঝখানের বর্ণনাকারীরা হযরত বারাআ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর শব্দগুলো হুবহু উদ্ধৃত করেননি। তাই তাদের কারো একজনের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলা যেতে পারে না যে, নবী করীম (সা) "মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ" শব্দগুলো নিজ হাতেই লেখেন। হতে পারে, সঠিক ঘটনা হয়তো এ রকম ছিল : যখন হযরত আলী "রসূলুল্লাহ" শব্দ কেটে দিতে অস্বীকার করেন তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে সে জায়গাটি জিজ্ঞেস করে নিয়ে নিজের হাতে সেটি

يٰعِبَادِيَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ اَرۡضِىۡ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿۵۶﴾
كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَةُ الۡمَوۡتِ ثُمَّ اِلَيۡنَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَـنُبَوِّئَنَّهُمۡ مِّنَ الۡجَـنَّةِ غُرَفًا تَجۡرِىۡ مِنۡ
تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ نِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ ﴿۵۸﴾ الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡا
وَعَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ ﴿۵۹﴾ وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ۖ
اللّٰهُ يَرۡزُقُهَا وَاِيَّاكُمۡ ۖ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۶۰﴾

হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো। আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।[৯৪] প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে[৯৫] যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতইনা উত্তম প্রতিদান কর্মশীলদের জন্য[৯৬] —তাদের জন্য যারা সবর করেছে[৯৭] এবং যারা নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে।[৯৮] কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৯৯]

কেটে দেন এবং তারপর তাঁর সাহায্যে বা অন্য কোন লেখকের সহায়তায় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ শব্দ লিখে দিয়ে থাকবেন। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় দু'জন লেখক চুক্তিনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, এদের একজন ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং অন্যজন ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (ফাতহুল বারি, ৫ খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)। কাজেই একজন লেখক যে কাজ করেননি দ্বিতীয়জন যে তা করেছেন, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। তবুও যদি বাস্তবেই এটা ঘটে থাকে যে, নবী করীম (সা) নিজের নাম নিজের পবিত্র হাতে লিখে দিয়েছেন, তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। দুনিয়ায় এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, একজন নিরক্ষর লোক শুধুমাত্র নিজের নামটি লেখা শিখে নিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই লিখতে পড়তে পারে না।

অন্য যে হাদীসটির ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষর দাবী করা হয়ে থাকে সেটি মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শাইবা এবং আমর ইবনে শুবাহ উদ্ধৃত করেছেন। তার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ

"ইন্তিকালের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন।"

কিন্তু প্রথমত সনদের দিক দিয়ে এটি অত্যন্ত দুর্বল রেওয়ায়াত, যেমন হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, ضعيف لا اصل له (অর্থাৎ এটি দুর্বল রেওয়ায়াত, এর কোন ভিত্তি নেই।)। দ্বিতীয়ত এর দুর্বলতাও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ যদি নবী করীম (সা) পরবর্তী পর্যায়ে লেখাপড়া শিখে থাকেন, তাহলে এটা সাধারণ্যে প্রচারিত হবার কথা। বহু সংখ্যক সাহাবী এ বিষয়টি বর্ণনা করতেন। এই সংগে নবী করীম (সা) কার কাছে বা কার কার কাছে লেখাপড়া শিখেছেন তাও জানা যেতো। কিন্তু একমাত্র মুজাহিদ যার কাছ থেকে একথা শুনেন সেই আওন ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ একথা বর্ণনা করেননি। আর এই আওনও সাহাবী নন। বরং তিনি একজন তাবেঈ। কোন্ সাহাবী বা কোন্ কোন্ সাহাবী থেকে তিনি একথা শুনেছেন তাও তিনি ঘুণাক্ষরেও বলেননি। একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের দুর্বল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এমন কোন কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যা অত্যন্ত সুপরিচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ঘটনার বিরোধিতা করে।

৯২. অর্থাৎ নিসন্দেহে এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহর মহা অনুগ্রহ স্বরূপ। এর মধ্যে রয়েছে বান্দার জন্য বিপুল পরিমাণ উপদেশ ও নসিহত। কিন্তু এ থেকে একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে যারা এর প্রতি ঈমান আনে।

৯৩. অর্থাৎ বারবার চ্যালেঞ্জের কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে, যদি তুমি রসূল হয়ে থাকো এবং আমরা যথার্থই সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকি, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় আমাদের দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে আসছো না কেন?

৯৪. এখানে হিজরাতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যদি মক্কায় আল্লাহর বন্দেগী করা কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। আল্লাহর পৃথিবী সংকীর্ণ নয়। যেখানেই তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে বসবাস করতে পারো সেখানে চলে যাও। তোমাদের জাতি ও দেশের নয় বরং আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। এ থেকে জানা যায়, আসল জিনিস জাতি ও দেশ নয় বরং আল্লাহর বন্দেগী। যদি কখনো জাতি ও দেশ প্রেমের দাবী এবং আল্লাহর বন্দেগীর দাবীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে তাহলে সেটিই হয় মু'মিনের ঈমানের পরীক্ষার সময়। যে সাচ্চা মু'মিন হবে, সে আল্লাহর বন্দেগী করবে এবং দেশ ও জাতিকে পরিত্যাগ করবে। আর যে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার হবে, সে ঈমান পরিত্যাগ করবে এবং নিজের দেশ ও জাতিকে আঁকড়ে ধরবে। এ আয়াতটি এ ব্যাপারে একেবারে সুস্পষ্ট যে, একজন সত্যিকার আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি দেশ ও জাতি প্রেমিক হতে পারে কিন্তু দেশ ও জাতি পূজারী হতে পারে না। তার কাছে আল্লাহর বন্দেগী হয় সব জিনিসের চেয়ে প্রিয় এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে সে এর কাছে বিকিয়ে দেয় কিন্তু দুনিয়ার কোন জিনিসের কাছে একে বিকিয়ে দেয় না।

৯৫. অর্থাৎ প্রাণের কথা ভেবো না। এ তো কখনো না কখনো চলে যাবেই। চিরকাল থাকার জন্য কেউই দুনিয়ায় আসেনি। কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা তোমাদের জন্য কোন চিন্তাযোগ্য বিষয় নয়। বরং আসল চিন্তাযোগ্য বিষয় হচ্ছে,

ঈমান কেমন করে বাঁচানো যাবে এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবী কিভাবে পূরণ করা যাবে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের ফিরে আমার দিকে আসতে হবে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঈমান হারিয়ে চলে আসো তাহলে এর ফল হবে ভিন্ন কিছু। আর ঈমান বাঁচাবার জন্য যদি প্রাণ হারিয়ে চলে আসো তাহলে এর পরিণাম হবে অন্য রকম। কাজেই আমার কাছে যখন ফিরে আসবে তখন কি নিয়ে ফিরে আসবে, কেবল একথাটিই চিন্তা করো। প্রাণের জন্য উৎসর্গীত ঈমান, না ঈমানের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ নিয়ে?

৯৬. অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক যদি ঈমান ও নেকীর পথে চলে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিতও হয়ে যাও এবং পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি ব্যর্থতার মৃত্যু বরণও করে থাকো তাহলে বিশ্বাস করো অবশ্যই এ ক্ষতিপূরণ হবে এবং নিছক ক্ষতিপূরণই হবে না বরং সর্বোত্তম প্রতিদানও পাওয়া যাবে।

৯৭. অর্থাৎ যারা সব রকমের সমস্যা, সংকট, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবিলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যারা ঈমান আনার বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। ঈমান ত্যাগ করা, উপকারিতা ও মুনাফা যারা নিজের চোখে দেখেছে এবং এরপরও তার প্রতি সামান্যতমও ঝুঁকে পড়েনি। যারা কাফের ও ফাসেকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি।

৯৮. অর্থাৎ যারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, কাজ-করবার ও বংশ-পরিবারের ওপর ভরসা করেনি বরং নিজেদের রবের ওপর ভরসা করেছে। যারা দুনিয়াবী উপায়-উপাদানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিছক নিজেদের রবের ভরসায় ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করার এবং প্রয়োজনে প্রত্যেকটি শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান তাঁর কাছে কখনো নষ্ট হবে না এবং বিশ্বাস রাখে যে, তিনি নিজের মু'মিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এ দুনিয়ায় সহায়তা দান করবেন এবং আখেরাতেও তাদের কার্যক্রমের সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

৯৯. অর্থাৎ হিজরাত করার ব্যাপারে তোমাদের প্রাণের চিন্তার মতো জীবিকার চিন্তায়ও পেরেশান হওয়া উচিত নয়। তোমাদের চোখের সামনে এই যে অসংখ্য পশুপাখি ও জলজপ্রাণী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্য থেকে কে তার জীবিকা বহন করে ফিরছে? আল্লাহই তো এদের সবাইকে প্রতিপালন করছেন। যেখানেই যায় আল্লাহর অনুগ্রহে এরা কোন না কোন প্রকারে জীবিকা লাভ করেই থাকে। কাজেই তোমরা একথা ভেবে সাহস হারিয়ে বসো না যে, যদি ঈমান রক্ষার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ি তাহলে খাবো কি? আল্লাহ যেখান থেকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে রিযিক দিচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদেরও দেবেন। ঠিক একথা সাইয়িদিনা মসীহ আলাইহিস সালাম তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

"কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয়ত একজনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে, নয় ত একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

যদি[১০০] তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ, এরপর এরা প্রতারিত হচ্ছে কোন্ দিক থেকে? আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সব জিনিস জানেন। আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[১০১] কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না।

তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না। এইজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর? তাহারা বুনেওনা, কাটেওনা, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে, সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটেনা; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ভাল ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব?' বা কি 'পান করিব?' বা 'কি পরিব?' কেননা পরজাতীয়েরাই এ সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা–ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৭ রুকূ'

আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০২] আসল জীবনের গৃহতো হচ্ছে পরকালীন গৃহ, হায়! যদি তারা জানতো।[১০৩] যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন সহসা তারা শিরক করতে থাকে, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত নাজাতের ওপর তাঁর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে এবং দুনিয়ার জীবনের মজা ভোগ করতে পারে।[১০৪] বেশ, শিগ্‌গীর তারা জেনে যাবে।

রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।"

(মথি ৬ : ২৪–৩৪)

কুরআন ও বাইবেলের এ উক্তিগুলোর পটভূমি অভিন্ন। সত্যের দাওয়াতের পথে এমন একটি পর্যায় এসে যায় যখন একজন সত্যপ্রিয় মানুষের জন্য উপকরণের জগতের সমস্ত সহায় ও নির্ভরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিছক আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ অবস্থায় যারা অংক কষে ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিচার করে এবং পা বাড়াবার আগে প্রাণরক্ষা ও জীবিকা উপার্জনের নিশ্চয়তা খুঁজে বেড়ায় তারা কিছুই করতে পারে না। আসলে এ ধরনের অবস্থা পরিবর্তিত হয় এমন সব লোকের শক্তির জোরে যারা প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সব ধরনের বিপদ মাথা পেতে নেবার জন্য নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়। তাদেরই ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসে যখন আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হয়ে যায় এবং তার মোকাবিলায় অন্য সমস্ত মত পথ অবনমিত হয়।

১০০. এখান থেকে আবার মক্কার কাফেরদের প্রতি বক্তব্যের মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

তারা কি দেখে না, আমি একটি নিরাপদ হারম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশেপাশে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?[১০৫] এরপরও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে? তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে, যখন তা তার সামনে এসে গেছে?[১০৬] জাহান্নামই কি এ ধরনের কাফেরদের আবাস নয়? যারা আমার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো।[১০৭] আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই সাথে আছেন।

১০১. এখানে "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" শব্দগুলোর দু'টি অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব যখন আল্লাহরই কাজ তখন একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। অন্যেরা প্রশংসালাভের অধিকার অর্জন করলো কোথায় থেকে? দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আল্লাহর শোকর, তোমরা নিজেরাও একথা স্বীকার করছো।

১০২. অর্থাৎ এর বাস্তবতা শুধুমাত্র এতটুকুই যেমন ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্য নেচে গেয়ে আমোদ করে এবং তারপর যার যার ঘরে চলে যায়। এখানে যে রাজা হয়ে গেছে সে আসলে রাজা হয়ে যায়নি বরং শুধুমাত্র রাজার অভিনয় করছে। এক সময় তার এ খেলা শেষ হয়ে যায়। তখন সে ঠিক তেমনি দীনহীন অবস্থায় রাজ সিংহাসন থেকে বিদায় নেয় যেভাবে এ দুনিয়ার বুকে এসেছিল। অনুরূপভাবে জীবনের কোন একটি আকৃতিও এখানে স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। যে যে অবস্থায়ই আছে সাময়িকভাবে একটি সীমিত সময়কালের জন্যই আছে। মাত্র কয়েকদিনের জীবনের সাফল্যের জন্য যারা প্রাণপাত করে এবং এরি জন্য বিবেক ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু আয়েশ আরামের উপকরণ ও শক্তি-প্রতিপত্তির জৌলুস করায়ত্ত করে নেয়, তাদের এ সমস্ত কাজ মন ভুলানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব খেলনার সাহায্যে তারা যদি দশ, বিশ বা ষাট সত্তর বছর মন ভুলানোর কাজ করে থাকে এবং তারপর শূন্য হাতে মৃত্যুর দরোজা অতিক্রম করে এমন জগতে পৌঁছে যায় যেখানকার স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনে তাদের এ খেলা এক প্রতিকারহীন রোগে পরিণত হয়, তাহলে এ ছেলে ভুলানোর লাভ কি?

১০৩. অর্থাৎ যদি তারা একথা জানতো, এ দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার অবকাশ মাত্র এবং মানুষের জন্য আসল জীবন, যা চিরকাল স্থায়ী হবে, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাহলে তারা এখানে পরীক্ষার সময়-কালকে খেলা-তামাশায় নষ্ট না করে এর প্রতিটি মুহূর্ত এমনসব কাজে ব্যবহার করতো যা সেই চিরন্তন জীবনের জন্য উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হতো।

১০৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম , ২৯ ও ৪১; সূরা ইউনুস, ২৯ ও ৩১ এবং সূরা বনী ইসরাঈল, ৮৪ টীকা।

১০৫. অর্থাৎ তারা যে মক্কা শহরে বাস করে, যে শহরে তারা পূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন করছে, কোন লাত বা হুবল কি একে হারম তথা নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছে? আরবের আড়াই হাজার বছরের চরম অশান্তি ও নৈরাজ্যের পরিবেশে এ স্থানটিকে সকল প্রকার বিশৃংখলা ও বিপর্যয় মুক্ত রাখা কি কোন দেবতা বা দেবীর সাধ্যায়ত্ত ছিল? আমি ছাড়া আর কে এর মর্যাদা রক্ষাকারী ছিল?

১০৬. অর্থাৎ নবী রিসালাতের দাবী করেছেন এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো। এখন বিষয়টি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। নবী যদি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা দাবী করে থাকেন, তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি তোমরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকো, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই।

১০৭. "সংগ্রাম-সাধনার" ব্যাখ্যা এ সূরা আনকাবুতের ৮ টীকায় করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সংগ্রাম-সাধনা করবে সে নিজের ভালোর জন্য করবে (৬ আয়াত)। এখানে এ নিশ্চিন্ততা দান করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে সারা দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষের বিপদ মাথা পেতে নেয় তাদেরকে মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদের হাত ধরেন, তাদেরকে পথ দেখান এবং তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। পথের প্রতিটি বাঁকে তিনি তাদেরকে আলো দেখান। যার ফলে কোন্‌টা সঠিক পথ ও কোন্‌টা ভুল পথ তা তারা দেখতে পায়। তাদের নিয়ত যতই সৎ ও সদিচ্ছা প্রসূত হয় ততই আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও হিদায়াতও তাদের সহযোগী হয়।

আর রূম

৩০

নামকরণ

প্রথম আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়–কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, "নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরাতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য রসূল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এটি অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের ৮ বছর আগের একটি ঘটনা। রোমের কায়সার মরিসের (Mauric) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ফোকাস (Phocas) নামক এক ব্যক্তি রাজ সিংহাসন দখল করে। সে প্রথমে কায়সারের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করায় তারপর নিজে কায়সারকে হত্যা করে পিতা ও পুত্রদের কর্তিত মস্তকগুলো কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর সে কায়সারের স্ত্রী ও তার তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার ফলে ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক ওজুহাত খুঁজে পান। কায়সার মরিস ছিলেন তাঁর অনুগ্রাহক। তাঁর সহায়তায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পিতা বলতেন। এ কারণে তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্বাসঘাতক ফোকাস আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে জুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের

এডেসার (বর্তমান উরফা) এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হাল্‌ব ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছে যান। রোমের রাজ পরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা আফ্রিকার গবর্নরের সাহায্য চাইলো। গবর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে (Heraclius) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী সহকারে কনষ্টান্টিনোপলে পাঠান। তার সেখানে পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসকে কায়সার পদে অভিসিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতিপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজীর ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা খতম হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কায়সারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এরপরও যুদ্ধ জারী রাখেন। বরং এরপর তিনি এ যুদ্ধকে অগ্নি উপাসক ও খৃষ্টবাদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খৃষ্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (অর্থাৎ নাস্তুরী, ইয়াকূবী ইত্যাদি) তারাও আক্রমণকারী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখাতে থাকে। এদিকে ইহুদিরাও অগ্নি উপাসকদেরকে সমর্থন দেয়। এমন কি খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী ইহুদী সৈন্যদের সংখ্যা ২৬ হাজারে পৌঁছে যায়।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধ ভাংগা স্রোত রোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই পূর্বদেশ থেকে প্রথম যে খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে সেটি ছিল ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেশক দখল করে। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খৃষ্টান জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খৃষ্টানকে এই শহরে হত্যা করা হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র আল কিয়ামাহ গীর্জা (Holy Sepulchre) ধ্বংস করে দেয়া হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি, যে সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হযরত মসীহকে তাতেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছিল, ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌঁছিয়ে দেয়। আর্চবিশপ যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খসরু পারভেজ বিজয়ের নেশায় যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বায়তুল মাকদিস থেকে হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা থেকে আন্দাজ করা যায়। তাতে তিনি বলেন ঃ

"সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে—

"তুমি বলে থাকো, তোমার খোদার প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুশালেম রক্ষা করলেন না কেন?"

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্দান, ফিলিস্তীন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যের সীমানা মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এটা এমন এক

সময় ছিল যখন মক্কা মু'আয্যমায় এর চাইতে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীনে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাবশার খৃষ্টান রাজ্যে (রোম সাম্রাজ্যের মিত্র দেশ) আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয় অভিযানের কথা ছিল সবার মুখেমুখে, মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আহলাদে আটখানা হয়ে উঠছিল। তারা মুসলমানদের বলতো, দেখো, ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয়লাভ করেছে এবং অহী ও নবুওয়াত অনুসারী খৃষ্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলছে। অনুরূপভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে ধ্বংস করে ছাড়বো।

এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় ঃ "নিকটবর্তী দেশে রোমানরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবার তারা বিজয়ী হবে। আর সেটি এমন দিন হবে যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মু'মিনরা খুশী হয়ে যাবে।" এর মধ্যে একটির পরিবর্তে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রোমানরা জয় লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময় বিজয় লাভ করবে। আপাতদৃষ্টে এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন একটিরও কয়েক বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোন দূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। তারা মক্কায় নির্যাতিত হয়ে চলছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত কোনদিক থেকে তাদের বিজয় লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে রোমের পরাজয়ের বহর দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। অগ্নি উপাসক সেনাদল ত্রিপোলির সন্নিকটে পৌঁছে তাদের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছিল। এশিয়া মাইনরে ইরানী সেনাদল রোমানদের বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করতে করতে বসফোরাস প্রণালীতে পৌঁছে গিয়েছিল ৬১৭ সালে তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের সামনে খিলৃকদুন (Chalcedon : বর্তমান কাযীকোই) দখল করে নিয়েছিল। কায়সার খসরুর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে আবেদন করলেন, আমি যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, "এখন আমি কায়সারকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দেবো না যতক্ষণ না তিনি শৃংখলিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হন এবং তাঁর শূলীবিদ্ধ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অগ্নি খোদার উপাসনা করেন।" অবশেষে কায়সার এমনই পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজে (Carthage : বর্তমান টিউনিস) চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। মোটকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যার ফলে রোমানরা ইরানীদের ওপর বিজয় লাভ করবে এ ধরনের কোন কথা কোন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারতো না। বরং বিজয় তো দূরের কথা তখন সামনের দিকে এ সাম্রাজ্য আর টিকে থাকবে এ আশাও কারো ছিল না।*

* Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. ii. P. 788, Modern Library, New York.

কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হলে মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। উবাই ইবনে খাল্‌ফ হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বাজী রাখে। সে বলে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করে তাহলে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো অন্যথায় তুমি আমাকে দশটা উট দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাজীর কথা জানতে পেরে বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে فِى بِضْعِ سِنِيْنَ আর আরবী ভাষায় بِضْعِ শব্দ বললে দশের কম বুঝায়। কাজেই দশ বছরের শর্ত রাখো এবং উটের সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে একশো করে দাও। তাই হযরত আবু বকর (রা) উবাইর সাথে আবার কথা বলেন এবং নতুনভাবে শর্ত লাগানো হয় যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে অন্যপক্ষকে একশোটি উট দেবে।

৬২২ সালে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাত করে মদীনা তাইয়েবায় চলে যান অন্যদিকে কায়সার হিরাক্লিয়াস নীরবে কষ্ট্যান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি পেছন দিক থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই প্রতি–আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গীর্জার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে খৃষ্টীয় গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস((Sergius) খৃষ্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূজা) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জাসমূহে ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থ সম্পদ সূদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। হিরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া থেকে নিজের আক্রমণ শুরু করেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্ট্রের জন্মস্থান আরমিয়াহ (Clorumia) ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহর মহিমা দেখুন, এই বছরেই মুসলমানরা বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মোকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। এভাবে সূরা রূমে উল্লেখিত দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের সময়সীমা শেষ হবার আগেই একই সংগে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর রোমান সৈন্যরা অনবরত ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করে যেতেই থাকে। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এরপর পারস্য সম্রাটদের আবাসস্থল বিধ্বস্ত করে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তারা তদানীন্তন ইরানের রাজধানী তায়াসফুনের (Ctesiphon) দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮ জন পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিন পরে কারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কুরআন মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছে এবং এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ সমস্ত রোম অধিকৃত এলাকার ওপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করে। ৬২৯ সালে "পবিত্র ক্রুশ"কে স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য কায়সার নিজে "বায়তুল মাকদিস" যান এবং এ বছরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা উমরাহ আদায় করার জন্য হিজরাতের পর প্রথম বার মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রবেশ করেন।

এ পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যে, পুরোপুরি সত্য ছিল এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না। আরবের বিপুল সংখ্যক মুশরিক এর প্রতি ঈমান আনে।

উবাই ইবনে খাল্ফের উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকরকে (রা) বাজীর একশো উট দিয়ে দিতে হয়। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবী (সা) হুকুম দেন, এগুলো সাদকা করে দাও। কারণ বাজী যখন ধরা হয় তখন শরীয়াতে জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখন তা হারাম হবার হুকুম এসে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধের ম.্যমে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফেরদের থেকে বাজীর অর্থ নিয়ে নেয়ার অনুমতি তো দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই সংগে হুকুম দেয়া হয়, তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দিতে হবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় বক্তব্য এভাবে শুরু করা হয়েছে, আজ রোমানরা পরাজিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী মনে করছে এ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আজ যে পরা।জত সেদিন সে বিজয়ী হয়ে যাবে।

এ ভূমিকা থেকে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের বাহ্য দৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র তাই দেখে যা তার চোখের সামনে থাকে। কিন্তু এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ বাহ্যদৃষ্টি যখন দুনিয়ার সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত অনুমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যখন শুধুমাত্র "আগামীকাল কি হবে" এতটুকু কথা না জানার কারণে মানুষ ভুল হিসেব করে বসে তখন সামগ্রিকভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে ইহকালীন বাহ্যিক জীবনের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এরি ভিত্তিতে নিজের সমগ্র জীবন পুঁজিকে বাজী রাখা মস্ত বড় ভুল, তাতে সন্দেহ নেই।

এভাবে রোম ও ইরানের বিষয় থেকে ভাষণ আখেরাতের বিষয়ের দিকে মোড় নিয়েছে এবং ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত বিভিন্নভাবে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আখেরাতের জীবন সম্ভব, যুক্তিসংগত এবং এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে রাখার স্বার্থেও তার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস করে বর্তমান জীবনের কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বাহ্যদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে কর্মসূচী গ্রহণ করার যে পরিণাম হয়ে থাকে তাই হতে বাধ্য।

এ প্রসংগে আখেরাতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব–জগতের যেসব নিদর্শনকে সাক্ষ–প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলো তাওহীদেরও প্রমাণ পেশ করে। তাই চতুর্থ রুকূ'র শুরু থেকে তাওহীদকে সত্য ও শিরককে মিথ্যা প্রমাণ করাই ভাষণের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং বলা হয়, মানুষের জন্য পুরোপুরি একনিষ্ঠ হয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী করা ছাড়া আর কোন প্রাকৃতিক ধর্ম নেই। শিরক বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই যেখানেই মানুষ এ ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে আবার সেই মহা বিপর্যয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময় দুনিয়ার দু'টি সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছে, এ বিপর্যয়ও শিরকের অন্যতম ফল এবং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা সবাই ছিল মুশরিক।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে উপমার মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মৃত পতিত যমীন আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির স্পর্শে সহসা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং জীবন ও ফসলের ভাণ্ডার উদ্‌গীরণ করতে থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রেরিত অহী ও নবুওয়াতও মৃত পতিত মানবতার পক্ষে রহমতের বারিধারা স্বরূপ এবং এর নাযিল হওয়া তার জন্য জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কল্যাণের উৎসের কারণ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে আরবের এ অনুর্বর ভূমি আল্লাহর রহমতে শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে এবং সমস্ত কল্যাণ হবে তোমাদের নিজেদেরই জন্য। আর এর সদ্ব্যবহার না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তারপর অনুশোচনা করেও কোন লাভ হবে না এবং ক্ষতিপূরণ করার কোন সুযোগই পাবে না।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۟ۚ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۟ۙ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۟ۙ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۟ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۟ۙ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۟

আলিফ–লাম–মীম। রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।[১] ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে।[২] আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে।[৩] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১. ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রোম ও ইরানের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমের পক্ষে এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল ইরানের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এক, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃষ্টবাদ ও অগ্নি পূজার মতবাদের যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল। তারা দেশ জয়ের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে একে অগ্নি পূজার মতবাদ বিস্তারের মাধ্যমে পরিণত করছিল। বায়তুল মাকদিস জয়ের পর খসরু পারভেজ রোমের কায়সারের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে নিজের বিজয়কে তিনি অগ্নি উপাসনাবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নীতিগতভাবে অগ্নি উপাসনাবাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের ধর্মের মিল ছিল। কারণ, তারাও ছিল তাওহীদ অস্বীকারকারী। তারা দুই খোদাকে মানতো এবং আগুনের

পূজা করতো। তাই মুশরিকরা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মোকাবিলায় খৃষ্টানরা যতই শিরকে লিপ্ত হয়ে যাক না কেন তবুও তারা তাওহীদকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে স্বীকার করতো। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো এবং অহী ও রিসালাতকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে মানতো। তাই তাদের ধর্ম তার আসল প্রকৃতির দিক থেকে মুসলমানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের ওপর মুশরিক জাতির বিজয়কে তারা অপছন্দ করতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এক নবীর আগমনের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীকে যারা মানতো নীতিগতভাবে তারা মুসলমানের সংজ্ঞারই আওতাভুক্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আগমনকারী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌছে এবং তারা তা অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। (দেখুন সূরা কাসাস, ৭৩ টীকা) সে সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচ–ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো বাইরে পৌছেনি। তাই মুসলমানরা খৃষ্টানদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করতো না। তবে ইহুদীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল কাফের। কারণ তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তৃতীয় কারণ ছিল, ইসলামের সূচনায় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৫ এবং সূরা মায়েদার ৮২ থেকে ৮৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক খোলা মন নিয়ে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করছিল। তারপর হাবশায় হিজরাতের সময় খৃষ্টান বাদশাহ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেন এবং তাদের ফেরত পাঠাবার জন্য মক্কার কাফেরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এরও দাবী ছিল মুসলমানরা অগ্নি পূজারীদের মোকাবিলায় খৃষ্টানদের কল্যাণকামী হোক।

২. অর্থাৎ পূর্বে যখন ইরানীরা জয়লাভ করে তখন নাউযুবিল্লাহ তার অর্থ এটা ছিল না যে, বিশ্ব–জাহানের প্রভু আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে গেছেন এবং পরে যখন রোমীয়রা জয়লাভ করবে তখন এর অর্থ এ হবে না যে, আল্লাহ তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন। সর্ব অবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। পূর্বে যে বিজয় লাভ করে তাকে আল্লাহই বিজয় দান করেন এবং পরে যে জয় লাভ করবে সেও আল্লাহরই হুকুমে জয়লাভ করবে। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউ নিজের শক্তির জোরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। তিনি যাকে উঠান সে–ই ওঠে এবং যাকে নামিয়ে দেন সে–ই নেমে যায়।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা), সুফিয়ান সওরী (র), সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বর্ণনা করেন, ইরানীদের ওপর রোমীয়রা এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর মুসলমানরা একই সময় বিজয় লাভ করেন। এ জন্য মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দিত হয়। ইরান ও রোমের ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ হয়। এ বছরই রোমের কায়সার অগ্নি উপাসনাবাদের প্রবর্তক যরথুষ্টের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং ইরানের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝

লোকেরা দুনিয়ার কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফিল।[৪] তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি?[৫] আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৬] কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।[৭]

৪. অর্থাৎ যদিও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করার মতো বহু সাক্ষ ও নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলো থেকে গাফিল হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তবুও এরা নিজেরাই গাফিল থাকছে। অন্য কথায় এটা তাদের নিজেদের ত্রুটি। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক পর্দার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা বসে রয়েছে। এর পেছনে যা কিছু আসছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। নয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাবার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করা হয়নি।

৫. এটি আখেরাতের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে যদি এরা বাইরে কোথাও দৃষ্টি দেবার পূর্বে নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেদের মধ্যেই এমন সব যুক্তি পেয়ে যেতো যা বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবনের প্রয়োজনের সত্যতা প্রমাণ করতো। মানুষের এমন তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে যা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে :

এক : পৃথিবী ও তার পরিবেশের অসংখ্য জিনিস তার বশীভূত করে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করার ব্যাপক ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে।

দুই : নিজের জীবনের পথ বেছে নেবার জন্য তাকে স্বাধীন ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। ঈমান ও কুফরী, আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পথের মধ্য থেকে যে কোন পথেই নিজের ইচ্ছামতো সে চলতে পারে। সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও বেঠিক যে কোন পথই সে অবলম্বন করতে পারে। প্রত্যেকটি পথে চলার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে এবং এ চলার জন্য সে আল্লাহর সরবরাহকৃত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে পারে তা আল্লাহর আনুগত্যের বা তাঁর নাফরমানির যে কোন পথই হোক না কেন।

তিন : তার মধ্যে জন্মগতভাবে নৈতিকতার অনুভূতি রেখে দেয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে সে ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে, ইচ্ছাকৃত কাজকে সৎকাজ ও অসৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে এই মত অবলম্বন করে যে, সৎকাজ পুরস্কার লাভের এবং অসৎকাজ শাস্তি লাভের যোগ্য হওয়া উচিত।

মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এই যে তিনটি বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, এমন কোন সময় আসা উচিত যখন মানুষের সমস্ত কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যখন তাকে জিজ্ঞস করা হবে, তাকে দুনিয়ায় যা কিছু দেয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করার ক্ষমতাকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে? যখন দেখা যাবে, নিজের নির্বাচনের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে সে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, না ভুল পথ? যখন তার ঐচ্ছিক কার্যাবলী যাচাই করা হবে এবং সৎকাজে পুরস্কার ও অসৎকাজে শাস্তি দেয়া হবে। একথা সুনিশ্চিত যে, মানুষের জীবনের কার্যাবলী শেষ হবার এবং তার কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবার পরই এ সময়টি আসতে পারে, তার আগে আসতে পারে না। আর এ সময়টি অবশ্যই এমন সময় আসা উচিত যখন এক ব্যক্তি বা একটি জাতির নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কোন ব্যক্তি বা জাতির নিজের কার্যাবলীর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে যেসব প্রভাব বিস্তার করে যায় উক্ত ব্যক্তি বা জাতির মৃত্যুতে তার ধারাবাহিকতা খতম হয়ে যায় না। তার রেখে যাওয়া ভালো বা মন্দ প্রভাবও তো তার আমলনামায় লিখিত হওয়া উচিত। এ প্রভাবগুলো যে পর্যন্ত না পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে যায় সে পর্যন্ত ইনসাফ অনুযায়ী পুরোপুরি হিসেব-নিকেশ করা এবং পুরোপুরি পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া কেমন করে সম্ভব? এভাবে মানুষের নিজের অস্তিত্ব একথার সাক্ষ পেশ করে এবং পৃথিবীতে মানুষকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে তা স্বতস্ফূর্তভাবে এ দাবী করে যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবন এমন হতে হবে যেখানে আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনসাফ সহকারে মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যাবলীর হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে।

৬. এ বাক্যে আখেরাতের সপক্ষে আরো দু'টি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মানুষ যদি নিজের অস্তিত্বের বাইরে বিশ্ব ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাহলে দু'টি সত্য সুস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিগোচর হবে :

এক : এ বিশ্ব-জাহানকে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন শিশুর খেলা নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য নিজের খেয়ালখুশী মতো সে উল্টা পাল্টা ধরনের যে কোন রকমের একটা ঘর তৈরি করেনি যা তৈরি করা ও ভেঙে ফেলা দুটোই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটি অণু পরমাণু এ কথারই সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, একে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তৈরী করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একটি আইন সক্রিয় রয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসই উদ্দেশ্যমূখী। মানুষের সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একথারই সাক্ষবহ। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করে এবং প্রত্যেকটি বস্তু যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেই মানুষ এখানে এ সবকিছু তৈরী করতে পেরেছে। অন্যথায় যদি একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন খেলনার

মধ্যে একটি পুতুলের মতো তাকে রেখে দেয়া হতো, তাহলে কোন প্রকার বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা কল্পনাই করা যেতো না। এখন যে জ্ঞানবান সত্তা এহেন প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখীতা সহকারে এ দুনিয়া তৈরি করেছেন এবং এর মধ্যে মানুষের মতো একটি সৃষ্টিকে সর্ব পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার, স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে নিজের দুনিয়ার অসংখ্য সাজ–সরঞ্জাম তার হাতে সঁপে দিয়েছেন, তিনি মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেছেন একথা কেমন করে তোমাদের বোধগম্য হলো? তোমরা কি দুনিয়ায় ভাঙা ও গড়া, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, জুলুম ও ইনসাফ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের যাবতীয় কাজ কারবার করার পর এমনিই মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তোমাদের কোন ভালো বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা যাবে না? তোমরা কি নিজেদের এক একটি কাজের মাধ্যমে তোমাদের ও তোমাদের মতো হাজার হাজার মানুষের জীবনের ওপর এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসের ওপর বহুতর শুভ ও অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলে যাবে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পরই এই সমগ্র কর্মদপ্তরকে এমনি গুটিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে?

এ বিশ্ব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর দ্বিতীয় যে সত্যটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে, এখানে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নির্ধারিত জীবনকাল রয়েছে। সেখানে পৌঁছে যাবার পর তা শেষ হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ব্যাপারেও একথাই সত্য। এখানে যতগুলো শক্তিই কাজ করছে তারা সবই সীমাবদ্ধ। একটি সময় পর্যন্ত তারা কাজ করছে। কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটি খতম হয়ে যাবে। প্রাচীনকালে যেসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দুনিয়াকে আদি ও চিরন্তন বলে প্রচার করতো তাদের বক্তব্য তবুও তো সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করতো কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব–জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে নিজের ভোটটি আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে দিয়ে দিয়েছে। কাজেই বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের নাম নিয়ে এ দাবী উত্থাপন করার কোন অবকাশই নেই যে, এ দুনিয়া চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামত কোনদিন আসবে না। পুরাতন বস্তুবাদিতার যাবতীয় ভিত্তি এ চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বস্তুর বিনাশ নেই, কেবলমাত্র রূপান্তর ঘটতে পারে। তখনকার চিন্তা ছিল, প্রত্যেক পরিবর্তনের পর বস্তু বস্তুই থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন কম বেশী হয় না। এরি ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত শুনানো হতো যে, এ বস্তুজগতের কোন আদি–অন্ত নেই। কিন্তু বর্তমানে আনবিক শক্তি (Atomic Energy) আবিষ্কারের ফলে এ সমগ্র চিন্তার ধারাই উল্টে গেছে। এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তার আকৃতিও থাকে না। ভৌতিক অবস্থানও থাকে না। এখন তাপের গতির দ্বিতীয় আইন (Second law of thermo-Dynamics) একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ বস্তুজগত না অনাদি হতে পারে, না অনন্ত। অবশ্যই এক সময় এর শুরু এবং এক সময় শেষ হতে হবে। তাই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানে কিয়ামত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞান যদি আত্মসমর্পন করে তবে দর্শন কিসের ভিত্তিতে কিয়ামত অস্বীকার করবে?

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো।[৮] তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল, তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে[৯] এবং এত বেশী আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি।[১০] তাদের কাছে তাদের রসূল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[১১] তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।[১২] শেষ পর্যন্ত যারা অসৎকাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল বড়ই অশুভ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা সেগুলোকে বিদ্রূপ করতো।

৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে, একথা বিশ্বাস করে না।

৮. আখেরাতের পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে, কেবল দুনিয়ার দু'চারজন লোকই তো আখেরাত অস্বীকার করেনি বরং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। বরং অনেক জাতির সমস্ত লোকই আখেরাত অস্বীকার করেছে অথবা তা থেকে গাফিল হয়ে গেছে কিংবা মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এমন মিথ্যা বিশ্বাস উদ্ভাবন করে নিয়েছে যার ফলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে গেছে। তারপর ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, যেভাবেই আখেরাত অস্বীকার করা হোক না কেন, তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হয়েছে। তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীল আচরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ জিনিসটির বদৌলতে জাতিসমূহ একের পর এক ধ্বংস হতে থেকেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে মানব বংশ একের পর এক যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা কি একথা প্রমাণ করে না যে, আখেরাত একটি সত্য, যা অস্বীকার করা মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুকে সবসময় মাটির দিকে নেমে আসতে দেখেছে বলেই সে ভারী জিনিসের আকর্ষণ স্বীকার করে। যে বিষ খেয়েছে সে-ই মারা পড়েছে, এ জন্যই মানুষ

বিষকে বিষ বলে মানে। অনুরূপভাবে আখেরাত অস্বীকার যখন চিরকাল মানুষের নৈতিক বিকৃতির কারণ প্রমাণিত হয়েছে তখন এ অভিজ্ঞতা কি এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আখেরাত একটি জাজ্বল্যমান সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা ভুল?

৯. মূল শব্দ হচ্ছে أَثَارُوا الْأَرْضَ কৃষিকাজ করার জন্য লাঙ্গল দেয়া অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে আবার মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভ থেকে পানি উঠানো, খাল খনন এবং খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বের করাও হয়।

১০. যারা নিছক বস্তুগত উন্নতিকে একটি জাতির সৎ হবার আলামত মনে করে এখানে তাদের যুক্তির জবাব রয়েছে। তারা বলে যারা পৃথিবীর উপায়–উপকরণকে এত বিপুল পরিমাণে ব্যবহার (Exploit) করেছে তারা দুনিয়ায় বিরাট উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং একটি মহিমান্বিত সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। কাজেই মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবেন এটা কেমন করে সম্ভব। কুরআন এর জবাব এভাবে দিয়েছে "এমন উন্নয়নমূলক কাজ" পূর্বেও বহু জাতি বিরাট আকারে করেছে। তারপর কি তোমরা দেখনি সে জাতিগুলো তাদের নিজেদের সভ্যতা–সংস্কৃতি সহকারে ধূলায় মিশে গেছে এবং তাদের "উন্নয়নের' আকাশচুম্বী প্রাসাদ ভুলুণ্ঠিত হয়েছে? যে আল্লাহর আইন ইহজগতে সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও সৎ চারিত্রিক গুণাবলী ছাড়া নিছক বস্তুগত নির্মাণের এরূপ মূল্য দিয়েছে সে একই আল্লাহর আইন কি কারণে পারলৌকিক জগতে তাকে জাহান্নামে স্থান দেবে না?

১১. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী নিয়ে যা তাদেরকে সত্য নবী হবার নিশ্চয়তা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানকার পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে নবীদের আগমনের কথা উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, এর বাইরে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থায় এবং মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় আখেরাতের সাক্ষ বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে একের পর এক নবীগণ এসেছেন। তাঁদের সাথে তাঁদের নবুওয়াত সত্য হবার সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যেতো এবং যথার্থই আখেরাতের আগমন সম্পর্কে তাঁরা মানুষকে সতর্কও করতেন।

১২. অর্থাৎ এরপর এ জাতিগুলো যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তা ছিল তাদের নিজেদের জুলুম। এসব জুলুম তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। যে ব্যক্তি বা দল নিজে সঠিক চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝিয়ে দেবার পরও সঠিক নীতি অবলম্বন করে না সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের জন্য দায়ী হয়। এ জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করা যেতে পারে না। আল্লাহ নিজের কিতাব ও নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের জ্ঞান দেবার ব্যবস্থাও করেছেন এবং তাকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্বিক উপকরণাদিও দিয়েছেন যেগুলো ব্যবহার করে সে সবসময় নবী ও আসমানী কিতাব প্রদত্ত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে পারে। এ পথনির্দেশনা এবং এ উপকরণাদি থেকে আল্লাহ যদি মানুষকে বঞ্চিত করে থাকতেন এবং সে অবস্থায় মানুষকে ভুল পথে যাবার ফল পেতে হতো তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহর বিরুদ্ধে জুলুমের দোষারোপ করার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারতো।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন।[১৩] *তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর যখন সে সময়টি*[১৪] *সমাগত হবে, সেদিন অপরাধী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে।*[১৫] *তাদের বানানো শরীকদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না*[১৬] *এবং তারা নিজেদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।*[১৭]

১৩. কথাটি দাবীর ভংগীতে বলা হলেও দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিও এর মধ্যে রয়ে গেছে। সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি একথার সাক্ষ দিয়ে থাকে যে, সৃষ্টির সূচনা করা যার পক্ষে সম্ভবপর তার পক্ষে একই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করা আরো ভালোভাবেই সম্ভবপর। সৃষ্টির সূচনা তো একটি বাস্তব সত্য, বিষয়টি সবার সামনেই রয়েছে। কাফের ও মুশরিকরাও এটাকে আল্লাহর কাজ বলে স্বীকার করে। এরপর যে আল্লাহ এ সৃষ্টির সূচনা করেন তিনি এর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না, তাদের এ চিন্তা একেবারেই অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ফিরে যাবার এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার সময়।

১৫. মূল শব্দ হচ্ছে ابلاس –এর অর্থ হচ্ছে চরম হতাশা ও দুঃখ-বেদনার কারণে কোন ব্যক্তির একেবারে হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। আশার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাওয়া এবং কোন যুক্তি ও সমর্থন না পাওয়ার কারণে রুদ্ধশ্বাস হওয়া। এ শব্দটি যখন অপরাধীর জন্য ব্যবহার করা হয় তখন মনের পাতায় তার যে ছবি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তিকে অপরাধ করার সময় হাতে নাতে পাকড়াও করা হয়েছে। সে পালাবার কোন পথ পাচ্ছে না এবং নিজের সাফাই গাইবার জন্য কোন জিনিস পেশ করে বের হয়ে আসার আশাও রাখে না। তাই তার কন্ঠরুদ্ধ এবং চরম হতাশা ও মনমরা অবস্থায় সে অবাক বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত একথাটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, এখানে অপরাধী বলতে কেবল দুনিয়ায় যারা হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও এ ধরনের অন্যান্য অপরাধ করে তাদের কথা বলা হয়নি বরং এমন সব লোকের কথা এখানে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাঁর রসূলদের শিক্ষা ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং আখেরাতে জবাবদিহি করার কথা অস্বীকার করে অথবা সে ব্যাপারে নির্বিকার থেকে এবং দুনিয়ায় আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের অথবা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে থেকেছে। এ মূল ভ্রষ্টতার

সাথে সাধারণ্যে অপরাধ বলা হয়ে থাকে এমন কাজ তারা করলেও বা না করলেও কিছু আসে যায় না। এ ছাড়াও এমনসব লোকও এর অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যারা আল্লাহকে মেনে নিয়ে তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনে আখেরাতকে স্বীকার করে নিয়ে তারপর আবার জেনে বুঝে নিজেদের রবের নাফরমানী করেছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের বিদ্রোহীনীতিতে অবিচল থেকেছে। এরা নিজেদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতে আখেরাতের জগতে হঠাৎ করে জেগে উঠবে এবং দেখবে, সত্যিই তো এখানে সেই পরবর্তী জীবন শুরু হয়ে গেছে, যা অস্বীকার করে অথবা যাকে উপেক্ষা করে তারা দুনিয়ায় কাজ করতো। তখন তাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে يبلس المجرمون বাক্যাংশে যার ছবি অংকন করা হয়েছে।

১৬. তিন ধরনের সত্তার ওপর শরীক শব্দটির প্রয়োগ হয়। এক, ফেরেশতা, নবী, আউলিয়া, শহীদ ও পুণ্যবান লোক। মুশরিকরা বিভিন্ন যুগে এদেরকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করে এদের সামনে বন্দেগী ও পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। কিয়ামতের দিন তারা পরিষ্কার বলে দেবে, এসব কিছু করেছো তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বরং আমাদের শিক্ষা ও পথনির্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের শাফায়াতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমরা কিছু আবেদন নিবেদন করবো, এ আশা আমাদের ব্যাপারে করো না। দুই, এমন সব জিনিস যেগুলোর চেতনা নেই অথবা প্রাণ নেই। যেমন ঃ চাঁদ, সূর্য, তারকা, গাছ, পাথর, পশু ইত্যাদি। মুশরিকরা তাদেরকে খোদায় পরিণত করে, এদের পূজা–উপাসনা করে এবং এদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু এই জড় ও নির্জীব জিনিসগুলো একথা জানতেই পারে না যে, আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ এসব নজরানা তাদের জন্য উৎসর্গ করছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এদের মধ্য থেকে একজনও তাদের সুপারিশের জন্য সামনে অগ্রসর হবে না। তিন, এমন সব বড় বড় অপরাধী যারা নিজেরাই চেষ্টা করে, ধোঁকা ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করে, মিথ্যার জাল ছড়িয়ে দিয়ে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাদের থেকে নিজেদের বন্দেগী ও পূজা আদায় করে নিয়েছে। যেমন শয়তান, ভণ্ড ধর্মীয় নেতা এবং জালেম ও স্বৈরাচারী শাসনকর্তা ইত্যাদি। এরা সবাই সেখানে বিপদের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত থাকবে। নিজেদের এ ভক্তবৃন্দের সুপারিশের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা বরং তারা নিজেদের আমলনামার বোঝা হালকা করার চেষ্টা করতে থাকবে। হাশরের ময়দানে তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকবে যে, এদের অপরাধের জন্য এরা নিজেরাই দায়ী এবং এদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমাদের দুর্ভোগ পোহানো উচিত নয়। এভাবে মুশরিকরা সেখানে কোন দিক থেকে কোন প্রকার শাফায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না।

১৭. অর্থাৎ সে সময় মুশরিকরা একথা স্বীকার করবে যে, তাদেরকে আল্লাহর শরীক করে তারা ভুল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্য থেকে কারো আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন অংশ নেই, এ সত্যটি তখন তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। তাই দুনিয়ায় আজ তারা যে শিরকের ওপর টিকে থাকার জন্য চাপ দিচ্ছে আখেরাতে তাকেই অস্বীকার করবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

যেদিন সেই সময়টি সমাগত হবে সেদিন (সমস্ত মানুষ) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[১৮] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা একটি বাগানে[১৯] আনন্দে থাকবে।[২০]

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় আজ জাতি, বংশ, গোত্র, স্বদেশ, ভাষা, পরিবার এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট যতগুলো দলীয় বিভক্তি রয়েছে এসবই সেদিন ভেঙ্গে পড়বে। নির্ভেজাল আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে নতুন করে এখন ভিন্নতর দল গঠিত হবে। একদিকে সমগ্র মানব জাতির পূর্বের ও পরের সমগ্র প্রজন্মের মধ্য থেকে মু'মিন ও সৎ লোকদেরকে ছেঁটে আলাদা করে নেয়া হবে এবং তাদের সবাই হবে একটি দলভুক্ত। অন্যদিকে এক ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণকারী এবং এক এক ধরনের অপরাধজীবী মানুষদেরকে সেই বিশাল জনসমুদ্র থেকে ছাঁটাই বাছাই করে আলাদা করে নেয়া হবে এবং তাদের পৃথক পৃথক দল সৃষ্টি হয়ে যাবে। অন্য কথায় এভাবে বলা যায়, ইসলাম যেসব জিনিসকে এ দুনিয়ায় বিভেদ অথবা ঐক্যের ভিত্তি গণ্য করে এবং যেগুলোকে জাহেলিয়াত পন্থীরা এখানে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আখেরাতে তারই ভিত্তিতে বিভেদও হবে আবার ঐক্যও।

ইসলাম বলে, মানুষদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং পরস্পরের সাথে জুড়ে দেবার আসল জিনিস হচ্ছে তার আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর তাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলে তারা সবাই একই দলভুক্ত। তাদের সম্পর্ক বিভিন্ন বংশ ও দেশের সাথেও হতে পারে। অন্যদিকে কুফরী ও ফাসেকীর পথ অবলম্বনকারীরা অন্য একটি দলভুক্ত। তাদের সম্পর্ক যে কোন বংশ ও দেশের সাথেও হতে পারে। এদের উভয়ের জাতীয়তা এক হতে পারে না। এরা দুনিয়ায় সম্মিলিতভাবে একক জীবনপথ নির্মাণ করে তার ওপর একসাথে চলতে পারে না। ওদিকে আখেরাতেও তাদের পরিণাম একই রকম হতে পারে না। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত তাদের পথ ও মনযিল পরস্পর থেকে আলাদা হয়। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াতপন্থীরা প্রত্যেক যুগে এ ব্যাপারে জোর দিতে থেকেছে এবং আজো তারা এ ব্যাপারে অবিচল যে, বংশ, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষের দলবদ্ধ হওয়া উচিত। যাদের মধ্যে এ ভিত্তিগুলোর ব্যাপারে একাত্মতা রয়েছে তাদের ধর্ম ও আকীদা–বিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক জাতিতে পরিণত হয়ে এমনি ধরনের অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত এবং এ জাতীয়তাবাদের এমন একটি জীবন ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে তাওহীদ, শিরক ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসীরা সবাই একসাথে চলতে পারে। এটিই ছিল আবু জেহেল, আবু লাহাব ও কুরাইশ সরদারদের চিন্তাধারা। তারা বারবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছিল যে, এ ব্যক্তি এসে আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদ এখানে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছে যে, এ

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছে[২১] তাদেরকে আযাবে হাজির রাখা হবে।

কাজেই[২২] আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো[২৩] যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়।[২৪] তিনি জীবিত থেকে মৃত্যুকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[২৫] অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

দুনিয়ায় মিথ্যার ভিত্তিতে তোমরা এই যেসব দল গঠন করেছো এগুলো সবই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে। ইসলাম দুনিয়ার এ জীবনে যে বিশ্বাস, জীবনাদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় মানব জাতির মধ্যে তারি ভিত্তিতে স্থায়ী পার্থক্য গড়ে উঠবে। যাদের গন্তব্য এক নয় তাদের জীবনের পথই বা কেমন করে এক হতে পারে।

১৯. 'একটি বাগান' কথাটি এখানে বাগানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার মতো আমাদের ভাষায়ও একটি পরিচিত বর্ণনাভংগী রয়েছে। কোন ব্যক্তি কাউকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বলে এবং এই সংগে একথাও বলে, যদি তুমি একাজটি করে দাও তাহলে আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। এখানে একটি জিনিসের অর্থ এ হয় না যে, সংখ্যার দিক দিয়ে তা একটিই হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হয়, এর পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস দেবো, যা পেয়ে তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হবে।

২০. এখানে মূলে يُحْبَرُونَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আনন্দ, স্বাদ, আড়ম্বর, জাঁকজমক ও মর্যাদার ধারণা এর অর্থের অন্তরভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে অত্যন্ত মর্যাদা

সহকারে রাখা হবে, আনন্দে ও আরাম–আয়েশে থাকবে এবং সব রকম ভোগে পরিতৃপ্ত হবে।

২১. একথাটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য যে, ঈমানের সাথে সৎকাজের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পরিণামফল ভোগ করবে। কিন্তু কুফরীর অশুভ পরিণাম বর্ণনা প্রসংগে অসৎকাজের কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, মানুষের পরিণাম নষ্ট করার জন্য কুফরীই যথেষ্ট। অসৎকাজের সাথে তার শামিল হওয়ায় বা না হওয়ায় কিছু যায় আসে না।

২২. এখানে "কাজেই" শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, যখন তোমরা জানতে পারলে ঈমান ও সৎকাজের এহেন পরিণাম হবে এবং কুফরী ও মিথ্যা আরোপের এহেন পরিণাম হবে তখন তোমাদের এ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া "কাজেই" শব্দটির এ অর্থও হয় যে, মুশরিক ও কাফেররা পরকালীন জীবনকে অসম্ভব গণ্য করে আল্লাহকে মূলত অক্ষম ও অপারগ ঘোষণা করছে। কাজেই এর মোকাবিলায় তুমি আল্লাহর প্রশংসা করো, তাঁর মহিমা প্রচার করো এবং এ দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত একথা ঘোষণা করে দাও। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মু'মিন সমাজকে।

২৩. আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা নিজেদের শিরক ও আখেরাত অস্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি যেসব দোষ–ত্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করে থাকে সেই অনন্য মহামহিম সত্ত্বাকে তা থেকে পাক–পবিত্র ঘোষণা করা এবং একথা প্রকাশ করা। এ ঘোষণা ও প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নামায। এরি ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন, এখানে "তাসবীহ পাঠ" তথা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ নামায পড়া। এ তাফসীরের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই রয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য কয়েকটি বিশেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ সমস্ত দোষ–ত্রুটিমুক্ত—এ আকীদা পোষণ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য আবার সকাল–সাঁঝে এবং দুপুরে (জোহর) ও রাতের ('ঈশা) নামাযের সময় নির্ধারণের প্রশ্নই উঠতো না। কারণ এ আকীদা তো মুসলমানদের সবসময়ই পোষণ করতে হবে। এভাবে যদি শুধুমাত্র মুখেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও এ সময়গুলো নির্ধারণ করার কোন অর্থ হয় না। কারণ মুসলমানকে তো সবসময় এ আকীদা প্রকাশ করতে হবে। এভাবে যদি নিছক কন্ঠের মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলেও এ সময়গুলো নির্ধারণ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ মুসলমানকে তো সর্বক্ষণ একথা প্রকাশ করতে হবে। তাই সময় নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহর গুণ ও মহিমা প্রচার করার হুকুম নিসন্দেহে তার একটি বিশেষ কার্যকর কাঠামোর প্রতিই ইংগিত করে। আর এ কার্যকর কাঠামোটি নামায ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৪. এ আয়াতে নামাযের চারটি সময়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে ঃ ফজর, মাগরিব, আসর ও যোহর। এ ছাড়াও নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন মজিদে আরো যেসব ইশারা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط

"নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠ করো।" (বনী ইসরাঈল, ৭৮)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط

"আর নামায কায়েম করো দিনের দুই মাথায় এবং রাতের কিছু অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর।" (হূদ, ১১৪ আয়াত)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ -

"আর তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্য উদিত হবার আগে এবং তার অস্ত যাবার আগে। আর রাতের কিছু সময়ও আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তভাগেও।" (ত্বা-হা, ১৩০ আয়াত)

এর মধ্য থেকে প্রথম আয়াতটি বলছে ঃ নামাযের সময়সীমা হচ্ছে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ঈশা পর্যন্ত এবং এরপর হচ্ছে ফজরের সময়। দ্বিতীয় আয়াতে দিনের দুই প্রান্ত অর্থ ফজর ও মাগরিবের সময় এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরের সময়টি হচ্ছে ঈশার ওয়াক্ত। তৃতীয় আয়াতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে অর্থ জফরের সময় এবং অস্তমিত হওয়ার পূর্বে অর্থ আসরের সময়। রাতের সময়ের মধ্যে মাগরিব ও ঈশা উভয়ই অন্তরভুক্ত। আর দিনের প্রান্ত হচ্ছে তিনটি ঃ এক, সকাল, দুই, সূর্য ঢলে পড়া এবং তিন, মাগরিব। এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানরা আজ যে পাঁচটি সময়ে নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে সে সময়গুলোর প্রতি ইংগিত করেছে। কিন্তু একথা স্পষ্ট শুধুমাত্র এ আয়াতগুলো পাঠ করে কোন ব্যক্তিও নামাযের সময় নির্ধারণ করতে পারতো না। মহান আল্লাহর নিযুক্ত কুরআনের শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাদেরকে পথনির্দেশনা না দিলে তাদের পক্ষে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

এখানে একটু থেমে হাদীস অস্বীকারকারীদের ধৃষ্ঠতার কথা ভাবুন। তারা "নামায পড়া" কে বিদ্রূপ করে এবং বলে, মুসলমানরা বর্তমানে যে নামায পড়ছে এটা আদতে সে জিনিসই নয় কুরআনে যার হুকুম দেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, কুরআন তো নামায কায়েম করার হুকুম দেয় এবং তার অর্থ নামায পড়া নয় বরং "রবুবিয়াতের ব্যবস্থা" কায়েম করা। এখন তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করুন, রবুবিয়াতের এ অভিনব ব্যবস্থাটি কোন্ ধরনের যাকে সূর্য উদিত হবার পূর্বেই কায়েম করা যেতে পারে অথবা আবার সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে কিছু রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্তও কায়েম করা যায় ? আর কোন্ ধরনের রবুবিয়াত ব্যবস্থা বিশেষ করে জুমার দিন কায়েম করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ?

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

আর বিশেষ ধরনের এমন কি রবুবিয়াত ব্যবস্থা আছে যা কায়েম করার জন্য মানুষ যখন অগ্রসর হয় তখন প্রথমে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নেয় এবং পা ধুয়ে ফেলে গাঁট পর্যন্ত আর এই সাথে মাথাও মসেহ করে নেয়, অন্যথায় তাকে কায়েম করা যেতে পারে না?

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

আর রবুবিয়াত ব্যবস্থার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে, যার ফলে যদি মানুষ নাপাকির অবস্থায় থাকে, তাহলে যতক্ষণ গোসল না করে নেয় ততক্ষণ তাকে কায়েম করতে পারে না?

لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ .... وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا .

আর এটাই বা কেমন ব্যাপার, যদি কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে মিলন করে এবং সেখানে পানি না পাওয়া যায় তাহলে এ অদ্ভুত রবুবিয়াত ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য পাক–পবিত্র মাটিতে হাত ঘসে নিয়ে সেই হাত মুখমণ্ডলের ওপর ঘসতে হবে?

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِنْهُ -

আর এ কেমন ধরনের অদ্ভুত রবুবিয়াত ব্যবস্থা যে, যদি কখনো সফর করতে হয় তাহলে মানুষ তাকে পুরোপুরি কায়েম করার পরিবর্তে অর্ধেকটাই কায়েম করে?

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

আর এটা কোন্ ধরনের কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে, যদি মুসলিম সেনাদল শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেনাদলের অর্ধেক সিপাহী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" কায়েম করতে থাকবে এবং বাকি অর্ধেক ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকবে? তারপর যখন প্রথম দলটি ইমামের পেছনে রবুবিয়াত ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে একটি সিজদা করে নেবে তখন উঠে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি তাদের জায়গায় এসে ইমামের পেছনে "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" কায়েম করতে থাকবে?

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَاۤئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَاۤئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَاۤئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ -

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

তাঁর[২৬] নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর সহসা তোমরা হলে মানুষ, (পৃথিবীর বুকে) ছড়িয়ে পড়ছো।[২৭]

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে,[২৮] যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো[২৯] এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৩০] অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো একথা পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে যে নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের নামায কায়েম করা যা সারা দুনিয়ার মুসলমানরা পড়ে থাকে। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে ইসলামকে পরিবর্তিত করার জন্য চাপ দিয়ে চলছে। আসলে যতক্ষণ কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর মোকাবিলায় একেবারেই শংকাহীন ও নির্লজ্জ না হয়ে যায় ততক্ষণ সে তাঁর বাণীর সাথে এ বিদ্রূপাত্মক আচরণ করতে পারে না, যা এরা করছে। অথবা এমন এক ব্যক্তি কুরআনের সাথে এ তামাশা করতে পারে যে নিজের মনে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকৃতি দেয় না এবং নিছক ধোঁকা দেবার জন্য কুরআন কুরআন বলে চিৎকার করে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করতে চায়। (এ প্রসঙ্গে সামনের দিকে ৫০ টীকাও দেখে নিন)

২৫. অর্থাৎ যে আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সামনে এ কাজ করছেন তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অক্ষম হতে পারেন কেমন করে? তিনি সবসময় জীবিত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারদের মধ্য থেকে বর্জ্য পদার্থ (Waste Matter) বের করছেন যেগুলোর মধ্যে জীবনের সামান্যতম গন্ধও নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিষ্প্রাণ বস্তুর (Dead Matter) মধ্যে জীবন সঞ্চার করে অসংখ্য পশু, উদ্ভিদ ও মানুষ সৃষ্টি করে চলছেন। অথচ যেসব উপাদান থেকে এ জীবন্ত সত্তাগুলোর শরীর গঠিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সামান্যতমও জীবনের চিহ্ন নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের এ দৃশ্য দেখিয়ে চলছেন যে, অনুর্বর, অনুন্নত, অনাবাদি পতিত জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথেই সহসা সেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের বিপুল সমারোহ দেখা যায়। এ সবকিছু দেখার পরও যদি কোন ব্যক্তি

মনে করে সৃষ্টির এ কারখানা পরিচালনাকারী আল্লাহ মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম, তাহলে আসলে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তার বাইরের চোখ দু'টি যে বাহ্যিক দৃশ্যাবলী দেখে থাকে, তার বুদ্ধির চোখ তার মধ্যে দৃশ্যমান উজ্জ্বল সত্য দেখতে পায় না।

২৬. মনে রাখতে হবে, এখান থেকে রুকু'র শেষ অবদি মহান আল্লাহর যেসব নিদর্শন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলো তো একদিকে বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে পরকালীন জীবনের সম্ভাবনা ও অস্তিত্বশীলতার কথা প্রমাণ করে এবং অন্যদিকে এ নিদর্শনগুলোই প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব–জাহান ইলাহ বিহীন নয় এবং এর ইলাহও বহু নয় বরং এক ও একক ইলাহই এর স্রষ্টা, পরিচালক, মালিক ও শাসক। তিনি ছাড়া মানুষের আর কোন মাবুদ হওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে এ রুকু'টি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পূর্বের ও পরের উভয় ভাষণের সাথে সম্পৃক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি রহস্য এ ছাড়া আর কি যে, কয়েকটি নিষ্প্রাণ উপাদানের সমাহার, যেগুলো এ পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায়। যেমন কিছু কার্বন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম এবং এ ধরনের আরো কিছু উপাদান। এগুলোর রাসায়নিক সংযোগের মাধ্যমে মানুষ নামক একটি বিস্ময়কর সত্ত্বা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা–কল্পনার এমন সব অদ্ভুত শক্তি যাদের কোন একটির উৎসও তার মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। তারপর শুধু এতটুকুই নয় যে, হঠাৎ একজন মানুষ এমনি ধরনের এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বরং তার মধ্যে এমন সব অদ্ভুত প্রজনন শক্তিও সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার বদৌলতে কোটি কোটি মানুষ সে একই কাঠামো এবং যোগ্যতার অধিকারী হয়ে অসংখ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং সীমাসংখ্যাহীন ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের ধারক হিসেবে বের হয়ে আসছে। তোমার বুদ্ধি কি এ সাক্ষ দেয়, এ চূড়ান্ত জ্ঞানময় সৃষ্টি কোন জ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম ছাড়াই আপনা আপনিই অস্তিত্বশীল হয়েছে? তুমি কি সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় একথা বলতে পারো, মানুষ সৃষ্টির মতো মহত্তম পরিকল্পনা, তাকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং পৃথিবী ও আকাশের সংখ্যাতীত শক্তিকে মানব জীবন গঠনের উপযোগী করে দেয়া, এগুলো কি বহু ইলাহর চিন্তা ও ব্যবস্থাপনার ফল হতে পারে? আর তোমরা যখন মনে করতে থাকো, যে আল্লাহ মানুষকে নিরেট অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি সেই মানুষকে মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না, তখন তোমাদের মস্তিষ্ক কি সঠিক অবস্থায় থাকে?

২৮. অর্থাৎ স্রষ্টার প্রজ্ঞার পূর্ণতা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র একটি জাতি (Sexes) সৃষ্টি করেননি বরং তাকে দু'টি জাতির আকারে সৃষ্টি করেছেন। মানবিকতার দিক দিয়ে তারা একই পর্যায়ভুক্ত। তাদের সৃষ্টির মূল ফরমুলাও এক। কিন্তু তারা উভয়ই পরস্পর থেকে ভিন্ন শারীরিক আকৃতি, মানসিক ও আত্মিক গুণাবলী এবং আবেগ–অনুভূতি ও উদ্যোগ নিয়ে জন্মলাভ করে। আবার তাদের মধ্যে এমন বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার ফলে তারা প্রত্যেকে পুরোপুরি অন্যের জোড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের শরীর এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যোগসমূহ অন্যের শারীরিক ও প্রবৃত্তির দাবীসমূহের পরিপূর্ণ জবাব। এ ছাড়াও সেই প্রাজ্ঞ স্রষ্টা এ উভয় জাতির

লোকদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকেই বরাবর এ আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করে চলবেন। আজ পর্যন্ত কখনো দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে বা কোন এলাকায় কেবলমাত্র পুত্র সন্তানই জন্মলাভ করছে, এমনটি দেখা যায়নি। অথবা কোথাও কেবলমাত্র কন্যা সন্তানই জন্মলাভ করে চলছে এমন কথাও শোনা যায়নি। এটা এমন একটা জিনিস যার মধ্যে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধি–কৌশল প্রয়োগের সামান্যতম অবকাশই নেই। মানুষ এ ব্যাপারে সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যে, মেয়েরা অনবরত এমন মেয়েলী বৈশিষ্ট এবং ছেলেরা অনবরত এমন পুরুষালী বৈশিষ্ট নিয়ে জন্মলাভ করতে থাকবে যা তাদের পরস্পরকে যথার্থ জোড়ায় পরিণত করবে। আর নারী ও পুরুষদের জন্ম এমনি ধারাবাহিকভাবে একটি আনুপাতিক হারে হয়ে যেতে থাকবে, এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার কোন মাধ্যম তার নেই। হাজার হাজার বছর থেকে কোটি কোটি মানুষের জন্মলাভে এ কৌশল ও ব্যবস্থার এমনই সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে কার্যকর থাকা কখনো নিছক আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না আবার বহু ইলাহর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার ফলও এটা নয়। এ জিনিসটি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে যে, একজন বিজ্ঞানী আর শুধুমাত্র একজন মহা বিজ্ঞানী স্রষ্টাই তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে শুরুতে পুরুষ ও নারীর একটি সর্বাধিক উপযোগী ডিজাইন তৈরি করেন। তারপর তিনি এ ডিজাইন অনুযায়ী অসংখ্য পুরুষ ও অসংখ্য নারীর তাদের পৃথক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট সহকারে সারা দুনিয়ায় একটি আনুপাতিক হারে জন্মলাভ করার ব্যবস্থা করেন।

২৯. অর্থাৎ এটা কোন অপরিকল্পিত ব্যবস্থা নয়। বরং স্রষ্টা নিজেই পরিকল্পিতভাবে এ ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে পুরুষ তার প্রাকৃতিক দাবী নারীর কাছে এবং নারী তার প্রাকৃতিক চাহিদা পুরুষের কাছে লাভ করবে এবং তারা উভয়ে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থেকেই প্রশান্তি ও সুখ লাভ করবে। এ বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনাকে স্রষ্টা একদিকে মানব বংশধারা অব্যাহত থাকার এবং অন্যদিকে মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। যদি এ দু'টি জাতিকে নিছক দু'টি পৃথক ডিজাইনে তৈরি করা হতো এবং তাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা সৃষ্টি না করা হতো, যা তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক ছাড়া প্রশান্তিতে পরিণত হতে পারতো না তাহলে সম্ভবত ছাগল–ভেড়ার মতো মানুষের বংশ ধারাও এগিয়ে যেতো কিন্তু তাদের সাহায্যে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। স্রষ্টা নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরস্পরের জন্য এমন চাহিদা, তৃষ্ণা ও অস্থিরতার অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার ফলে তারা উভয়ে মিলে একসাথে না থাকলে শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে না। সমগ্র প্রাণীজগতের বিপরীতে মানব জাতির মধ্যে এটিই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ। এ শান্তির অন্বেষাই তাদেরকে একত্রে ঘর বাঁধতে বাধ্য করে। এরি বদৌলতে পরিবার ও গোত্র অস্তিত্ব লাভ করে। এর ফলে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এ বিকাশে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা অবশ্যই সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তা তার আসল উদ্দোক্তা নয়। আসল উদ্দোক্তা হচ্ছে এ অস্থিরতা, যাকে পুরুষ ও নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে "ঘর" বাঁধতে বাধ্য করা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা ভাবতে পারেন যে, এ বিপুল প্রজ্ঞা প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ থেকে হঠাৎ এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে? অথবা বহু সংখ্যক ইলাহ কি এমনি ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতো, যার ফলে তারা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি[৩১] এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য।[৩২] অবশ্যই তার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে ঘুমানো এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা।[৩৩] অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন এমনসব লোকদের জন্য যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে।

এ গভীর জ্ঞানময় উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাজার হাজার বছর থেকে অনবরত অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে এ বিশেষ অস্থিরতা সহকারে সৃষ্টি করে যেতে থাকতো? এ তো একজন জ্ঞানীর এবং মাত্র একজন জ্ঞানীরই প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কেবলমাত্র বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিই এটি দেখতে অস্বীকার করতে পারে।

৩০. ভালোবাসা বলতে এখানে কামসিক্ত ভালোবাসার (Sexual Love) কথা বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এটি আকর্ষণের প্রাথমিক উদ্দোক্তায় পরিণত হয়। তারপর তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন করে রাখে। আর "রহমত" তথা দয়া মানে হচ্ছে এমন একটি আত্মিক সম্পর্ক, যা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এর বদৌলতে তারা দু'জনে দু'জনার কল্যাণাকাংখী, দু'জনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং উভয়ের সুখে-দুখে শরীক হয়ে যায়। এমনকি এমন এক সময় আসে যখন কামসিক্ত ভালোবাসা পেছনে পড়ে থাকে এবং বার্ধক্যে এ জীবনসাথী যৌবনকালের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে পরস্পরের জন্য দয়া, স্নেহ ও মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। মানুষের মধ্যে শুরুতেই যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তাকে সাহায্য করার জন্য স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ দু'টি ইতিবাচক শক্তি সৃষ্টি করে দেন। এ অস্থিরতা তো শুধুমাত্র শান্তির প্রত্যাশী এবং এর সন্ধানে সে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের দিকে নিয়ে যায়। এরপর এ দু'টি শক্তি অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এমন একটি সম্পর্ক জুড়ে দেয় যা দু'টি পৃথক পরিবেশে লালিত আগন্তুকদেরকে একসাথে মিলিয়ে গভীরভাবে সংযুক্ত করে দেয়। এ সংযোগের ফলে সারা জীবন তারা মাঝ দরিয়ায় নিজেদের নৌকা একসাথে চালাতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবনে এই যে ভালোবাসা ও দয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করছে এগুলো কোন নিরেট বস্তু নয়। এগুলোকে ওজন ও পরিমাপ

করা যেতে পারে না। মানুষের শারীরিক গঠনে যেসব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তাদের মধ্যে কোথাও এদের উৎস চিহ্নিত করা যেতে পারে না। কোন ল্যাবরেটরীতেও এদের জন্ম ও বিকাশ সাধনের কারণসমূহ অনুসন্ধান করা যেতে পারে না। এ ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যাই করা যেতে পারে না যে, একজন প্রাজ্ঞ স্রষ্টা স্বেচ্ছাকৃতভাবে একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে মানুষের মধ্যে তা সংস্থাপন করে দিয়েছেন।

৩১. অর্থাৎ তাদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করা, একটি অপরিবর্তনীয় নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অসংখ্য শক্তির পরম সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সহকারে কাজ করা—এগুলো নিজের অভ্যন্তরে এ বিষয়ের এমন বহু নিদর্শন রাখে যা থেকে জানা যায় যে, এ সমগ্র বিশ্ব–জাহানকে মাত্র একজন স্রষ্টাই অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই এ বিশাল ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। একদিকে যদি একথা চিন্তা করা যায় যে, এ প্রাথমিক শক্তি (Energy) কোথা থেকে এসে বস্তুর আকার ধারণ করেছে? বস্তুর এ বিভিন্ন উপাদান কেমন করে গঠিত হয়েছে এ উপাদানগুলোকে এহেন বৈজ্ঞানিক কৌশলে সংমিশ্রিত করে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সহকারে এ অত্যদ্ভুত বিশ্বব্যবস্থা গঠিত হয়েছে কেমন করে? এখন কোটি কোটি বছর ধরে একটি মহাপরাক্রমশালী প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে এ ব্যবস্থাটি কিভাবে চলছে? এ অবস্থায় প্রত্যেক নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে যে, এসব কিছু একজন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছাড়া নিছক ঘটনাক্রমে বা অকস্মাত ঘটতে পারে না। আবার অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে বিশ্ব–জাহানের দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত সবাই একই ধরনের উপাদানে গঠিত এবং একই প্রাকৃতিক আইনের নিয়ন্ত্রণে তারা চলছে, তাহলে হঠকারিতামুক্ত প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিই নিসন্দেহে একথা স্বীকার করবে যে, এ সবকিছু বহু ইলাহর কর্মকুশলতা নয় বরং একজন ইলাহ এ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক।

৩২. অর্থাৎ যদিও তোমাদের বাকশক্তি সমান নয়, মুখ ও জিহবার গঠনেও কোন ফারাক নেই এবং মস্তিষ্কের গঠনাকৃতিও একই রূপ তবুও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তোমাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেছে। তারপর একই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বিভিন্ন শহর ও জনপদের ভাষাও আলাদা। আবার আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বলার রীতি, শব্দের উচ্চারণ এবং আলাপ–আলোচনার পদ্ধতি আলাদা। অনুরূপভাবে তোমাদের সৃষ্টি উপাদান এবং তোমাদের গঠনসূত্র একই। কিন্তু তোমাদের বর্ণ এত বেশী বিভিন্ন যে, একেক জাতির কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু একই বাপ–মায়ের দু'টি সন্তানের বর্ণও সম্পূর্ণ একই হয় না। এখানে নমুনা হিসেবে কেবলমাত্র দু'টি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখুন, দুনিয়ায় সকল দিকেই আপনি এত বেশী বৈচিত্র (VARAITY) দেখতে পাবেন যে, তাদের সবগুলোকে একত্র করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসের যে কোন একটি শ্রেণীকে নেয়া হোক, দেখা যাবে তাদের প্রতিটি এককের মধ্যে মৌলিক একাত্মতা সত্ত্বেও অসংখ্য বিভিন্নতা বিরাজ করছে। এমন কি কোন এক শ্রেণীর একটি এককও অন্য একটি এককের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল নয়। এমন কি একটি গাছের দু'টি পাতার মধ্যেও পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এ জিনিসটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন কারখানা নেই যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনপত্র চলছে এবং

বিপুল উৎপাদনের (Massproduction) পদ্ধতিতে সব রকমের জিনিসের এক একটি ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে একই ধরনের জিনিস বের হয়ে আসছে। বরং এখানে এমন একজন জবরদস্ত কারিগর কাজ করছেন যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ সহকারে একটি নতুন ডিজাইনে, নতুন নকশায় ও কারুকাজে, নতুন সৌষ্ঠবে এবং নতুন গুণাবলী সহকারে তৈরি করেন। তাঁর তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিস স্বকীয় বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতা সবসময় সব জিনিসের একটি নতুন মডেল বের করে চলেছে। তাঁর শিল্পকারিতা একটি ডিজাইনকে দ্বিতীয়বার সামনে নিয়ে আসাকে নিজের পূর্ণতার জন্য অবমাননাকর মনে করে। যে ব্যক্তিই এ বিস্ময়কর দৃশ্য চোখ মেলে দেখবে সে কখনো এ ধরনের মূর্খতা সুলভ ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা একবার এ কারখানাটি চালিয়ে দিয়ে তারপর নিজে কোথাও গিয়ে ঘুমাচ্ছেন, তিনি যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং নিজের সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিচ্ছেন, এতো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩৩. অনুগ্রহ সন্ধান করা অর্থ জীবিকার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালানো। মানুষ যদিও সাধারণত রাতের বেলা ঘুমায় এবং দিনের বেলায় জীবিকার জন্য চেষ্টা-মেহনত করে তবুও শতকরা একশো ভাগ লোক এমনটি করে না। বরং বহুলোক দিনের বেলায় ঘুমায় এবং রাতে জীবিকা উপার্জনের জন্য মেহনত করে। তাই রাত দিনকে একসাথে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দু'টি সময়ে তোমরা ঘুমাও এবং নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টাও চালিয়ে থাকো।

এটিও এমন ধরনের নিদর্শনাবলীর অন্যতম যেগুলো থেকে একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টার ব্যবস্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায়। বরং এ ছাড়াও এ জিনিসটি এও চিহ্নিত করে যে, তিনি নিছক স্রষ্টা নন বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই করুণাশীল ও স্নেহময় এবং তার প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্য তার চেয়ে বেশী তিনি চিন্তা করেন। মানুষ দুনিয়ায় অনবরত পরিশ্রম করতে পারে না। বরং প্রত্যেকবার কয়েক ঘন্টা মেহনতের পর তাকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হয়। এভাবে আবার সে কয়েক ঘন্টা মেহনত করার শক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে মহাজ্ঞানী ও করুণাময় স্রষ্টা মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র ক্লান্তির অনুভূতি এবং কেবলমাত্র বিশ্রামের আকাংখা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং "নিদ্রা"র এমন একটি জবরদস্ত চাহিদা তার অস্তিত্বের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যার ফলে তার ইচ্ছা ছাড়াই এমন কি তার বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনা আপনিই কয়েক ঘন্টার জাগরণ ও মেহনতের পর তা তাকে পাকড়াও করে, কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে তাকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আপনা আপনিই তাকে ত্যাগ করে। এ নিদ্রার স্বরূপ ও অবস্থা এবং এর মৌল কারণগুলো আজো মানুষ অনুধাবন করতে পারেনি। এটি অবশ্যই জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এবং তার কাঠামোয় রেখে দেয়া হয়েছে। এটি যে যথাযথভাবে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে, এটা একথার সাক্ষ পেশ করার জন্য যথেষ্ট যে, এটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং কোন মহাজ্ঞানী সত্তা একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে একটি বিরাট জ্ঞান, কল্যাণ ও উদ্দেশ্যমুখীতা পরিষ্কার সক্রিয় দেখা যায়। এ ছাড়াও এ নিদ্রা একথারও সাক্ষবহ যে, যিনি মানুষের মধ্যে এ বাধ্যতামূলক উদ্যোগ রেখে দিয়েছেন তিনি নিজেই মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশী

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত হচ্ছে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎচমক ভীতি ও লোভ সহকারে।[৩৪] আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর এর মাধ্যমে জমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[৩৫] অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।

কল্যাণকামী। অন্যথায় মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিদ্রার বিরোধিতা করে এবং জোরপূর্বক জেগে থেকে এবং অনবরত কাজ করে কেবল নিজের কর্মশক্তিই নয় জীবনী শক্তিও ক্ষয় করে।

তারপর জীবিকার অন্বেষণের জন্য "আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান" শব্দাবলীর ব্যবহার করার মাধ্যমে নিদর্শনাবলীর অন্য একটি ধারাবাহিকতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদি পৃথিবী ও আকাশের বিপুল ও অগণিত শক্তি সম্ভারকে জীবিকার কার্যকারণ ও উপায় উপকরণ সৃষ্টি করার কাজে না লাগিয়ে দেয়া হতো এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবিকার অসংখ্য উপায়–উপকরণ সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে মানুষ এ জীবিকার সন্ধানইবা কোথায় করতে পারতো। শুধুমাত্র এতটুকুই নয় বরং জীবিকার এ অনুসন্ধান এবং তা উপার্জন এমন অবস্থায়ও সম্ভব হতো না যদি এ কাজের জন্য মানুষকে সর্বাধিক উপযোগী অংগ–প্রত্যংগ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা না দান করা হতো, কাজেই মানুষের মধ্যে জীবিকা অন্বেষণের যোগ্যতা এবং তার অস্তিত্বের বাইরে জীবিকার উপকরণাদি বিদ্যমান থাকা পরিষ্কারভাবে একজন দয়াশীল ও মর্যাদাবান সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি অসুস্থ না হলে কখনো কেউ এ ধারণা করতে পারতো না যে, এ সবকিছু অকস্মাত হয়ে গেছে অথবা এসব বহু ইলাহর ইলাহিত্বের ফল কিংবা কোন নির্দয় অন্ধশক্তি এ অনুগ্রহ ও দানের উৎস।

৩৪. অর্থাৎ তার মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎচমক থেকে তো একদিকে আশা হয় বৃষ্টি হবে এবং মাঠ শস্যে ভরে যাবে। কিন্তু সাথে সাথে এ ভয়ও জাগে যে, কোথাও বিজলী পড়ে বা অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়ে বানের তোড়ে সবকিছু ভাসিয়ে না নিয়ে যায়।

৩৫. এ জিনিসটি একদিকে মৃত্যু পরের জীবনের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে এবং অন্যদিকে এ জিনিসটিই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আছেন এবং এক আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। জমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির খাদ্য। এ উৎপাদন নির্ভর করে জমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। আবার এ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের ওপর। সরাসরি জমির ওপর এ বৃষ্টিপাত হতে পারে। অথবা পানির বিশাল ভাণ্ডার জমির উপরিভাগে স্থান লাভ করতে পারে। কিংবা ভূগর্ভস্থ ঝরণা ও কূপের রূপলাভ করতে পারে। অথবা পাহাড়ের ওপর বরফের আকারে জমাট বদ্ধ হয়ে নদ–নদীর সাহায্যে প্রবাহিত হতে পারে। তারপর এ বৃষ্টিপাত আবার নির্ভর করে সূর্যের উত্তাপ, মওসুম পরিবর্তন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে।[৩৬] তারপর যখনই তিনি পৃথিবী থেকে তোমাদের আহবান জানিয়েছেন তখনই একটি মাত্র আহবানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।[৩৭] আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছুই আছে সবই তাঁর বান্দা, সবাই তাঁর হুকুমের তাঁবেদার। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তার পুনরাবর্তন করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর।[৩৮] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর গুণাবলী শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

মহাশূন্যের তাপমাত্রা ও শৈত্য, বাতাসের আবর্তন এবং এমন বিদ্যুতের ওপর যা মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। এই সংগে বৃষ্টির পানির মধ্যে এক ধরনের প্রাকৃতিক লবণাক্ততাও সৃষ্টি করে দেয়। পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এসব বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তারপর এসবের অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের জন্য সুস্পষ্টভাবে উপযোগী হওয়া এবং হাজার হাজার লাখো লাখো বছর পর্যন্ত এদের পূর্ণ একাত্মতা সহকারে অনবরত সহযোগিতার ভূমিকা পালন করে যেতে থাকা, এ সবকিছু কি নিছক ঘটনাক্রমিক হতে পারে? এ সবকিছু কি একজন স্রষ্টার জ্ঞানবত্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হয়ে গেছে? এ সবকিছু কি একথার প্রমাণ নয় যে, পৃথিবী, সূর্য, বাতাস, পানি, উত্তাপ ও শৈত্য এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও রব একজনই?

৩৬. অর্থাৎ তাঁর হুকুমে একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে শুধু এতটুকু নয় বরং তাদের সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাদের মধ্যে একটি বিশাল নির্মাণ কারখানার প্রতিনিয়ত সচল থাকাও তাঁরই হুকুমের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি তার হুকুম তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত না রাখে, তাহলে এ সমগ্র ব্যবস্থা এক নিমেষেই ওলট পালট হয়ে যাবে।

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم
مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم
مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

তিনি নিজেই তোমাদের জন্য[৩৯] তোমাদের আপন সত্তা থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তোমাদের যেসব গোলাম তোমাদের মালিকানাধীন আছে তাদের মধ্যে কি এমন কিছু গোলাম আছে যারা আমার দেয়া ধন-সম্পদে তোমাদের সাথে সমান অংশীদার এবং তোমরা তাদেরকে এমন ভয় করো যেমন পরস্পরের মধ্যে সমকক্ষদেরকে ভয় করে থাকো?[৪০]—যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাদের জন্য আমি এভাবে আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। কিন্তু এ জালেমরা না জেনে বুঝে নিজেদের চিন্তা-ধারণার পেছনে ছুটে চলছে। এখন আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে পথ দেখাতে পারে?[৪১] এ ধরনের লোকদের কোন সাহায্যকারী হতে পারে না।

৩৭. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালকের পক্ষে তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করে উঠিয়ে নিয়ে আসা তেমন কোন বড় কাজ নয়। এ জন্য তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। বরং তাঁর মাত্র একটি আহবানেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্মলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তারা সবাই একসাথে পৃথিবীর সকল দিক থেকে বের হয়ে আসতে থাকবে।

৩৮. প্রথমবার সৃষ্টি করাটা যদি তাঁর জন্য কঠিন না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কেমন করে ধারণা করতে পারলে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে? প্রথমবারের সৃষ্টির মধ্যে তো তোমরা সশরীরেই উপস্থিত আছো। তাই এটা যে কঠিন নয় তা তো সুস্পষ্ট। এখন এটি একটি সহজ বুদ্ধির ব্যাপার যে, একবার যিনি কোন একটি জিনিস তৈরি করেন সে জিনিসটি পুনর্বার তৈরি করা তার জন্য তুলনামূলকভাবে আরো অনেক বেশী সহজ হওয়ার কথা।

৩৯. এ পর্যন্ত তাওহীদ ও আখেরাতের বর্ণনা মিলেমিশে চলছিল। এর মধ্যে যেসব নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাওহীদের প্রমাণও রয়েছে এবং এ প্রমাণগুলো আখেরাতের আগমন যে অসম্ভব নয় সে কথা প্রমাণ করে। এরপর সামনের দিকে নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

৪০. পৃথিবী ও আকাশ এবং তাদের মধ্যকার যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, মুশরিকরা একথা স্বীকার করার পর তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহর সার্বভৌম সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতার অংশীদার গণ্য করতো। তাদের কাছে প্রার্থনা করতো তাদের সামনে মানত ও নাযরানা পেশ করতো এবং বন্দেগী ও পূজার অনুষ্ঠান করতো। এসব বানোয়াট শরীকদের ব্যাপারে তাদের মূল আকীদার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় পঠিত "তালবীয়াহ" থেকে। এ সময় তারা বলতো ঃ

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هولك تملكه وماملك

"আমি হাজির আছি, হে আমার আল্লাহ আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক নেই তোমার নিজের শরীক ছাড়া। তুমি তারও মালিক এবং যা কিছু তার মালিকানায় আছে তারও মালিক তুমি।" (তাবারানী ঃ ইবনে আব্বাস বর্ণিত)

এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ এ শিরকটিই খণ্ডন করছেন। এখানে দৃষ্টান্তটির অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে কখনো আল্লাহরই সৃষ্টি যে মানুষ ঘটনাক্রমে তোমার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে তোমার অংশীদার গণ্য হতে পারে না। কিন্তু তোমরা অদ্ভুত ধান্দাবাজী শুরু করেছো, আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানে আল্লাহর সৃষ্টিকে নির্দ্বিধায় তাঁর সাথে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক গণ্য করছো। এ ধরনের নির্বোধ জনোচিত কথাগুলো চিন্তা করার সময় তোমাদের বুদ্ধি–জ্ঞান কি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আন নাহ্‌ল, ৬২ টীকা)

৪১. অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি সহজ–সরল বুদ্ধির কথা নিজেও চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝাবার পরও বুঝতে চায় না তখন তার বুদ্ধির ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। এরপর এমন প্রত্যেকটি জিনিস, যা কোন নিষ্ঠাবান ও বিবেকবান ব্যক্তিকে সত্যকথা পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করে, তা এ হঠকারী মূর্খতাপ্রিয় ব্যক্তিকে আরো বেশী গোমরাহীতে লিপ্ত করতে থাকে। এ অবস্থাটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে "পথ ভ্রষ্টতা" শব্দের মাধ্যমে। সত্যপ্রিয় মানুষ যখন আল্লাহর কাছে সঠিক পথনির্দেশ লাভের সুযোগ চায় তখন আল্লাহ তার সত্য আকাংখা অনুযায়ী তার জন্য বেশী করে সঠিক পথনির্দেশের কার্যকারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন। আর গোমরাহী প্রিয় মানুষ যখন গোমরাহীর ওপর টিকে থাকার জন্য জোর দিতে থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য আবার এমন সব কার্যকারণ সৃষ্টি করে যেতে থাকেন যা তাকে বিপথগামী করে দিনের পর দিন সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

কাজেই[৪২] (হে নবী এবং নবীর অনুসারীবৃন্দ) একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এ দীনের[৪৩] দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও।[৪৪] আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।[৪৫] আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না।[৪৬] এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দীন।[৪৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৪২. এখানে "কাজেই" শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, সত্য যখন তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং তোমরা যখন জানতে পেরেছো এ বিশ্ব-জাহানের ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয় তখন এরপর অপরিহার্যভাবে তোমাদের কার্যধারা এ ধরনের হওয়া উচিত।

৪৩. কুরআন "দীন" শব্দটিকে যে বিশেষ অর্থে পেশ করছে "দীন" শব্দটি এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বন্দেগী, ইবাদাত ও আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এতে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে কাউকে তাঁর সাথে সামান্যতমও শরীক করা যায় না। এখানে মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে একথা মেনে নেয় যে, সে তার সমস্ত জীবনে আল্লাহর পথনির্দেশ এবং তাঁর আইন মেনে চলবে।

৪৪. "একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এদিকে স্থির নিবদ্ধ করো" অর্থাৎ এরপর আবার অন্যদিকে ফিরো না। জীবনের জন্য এ পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কোন পথের দিকে দৃষ্টিও দেয়া যাবে না। তারপর তোমাদের চিন্তা-ভাবনা হবে মুসলমানের মতো এবং তোমাদের পছন্দ অপছন্দও হবে মুসলমানদের মতো। তোমাদের মূল্যবোধ ও মানদণ্ড হবে তাই যা ইসলাম তোমাদের দেয়। তোমাদের স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন ও কার্যক্রমের ছাঁচ ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী হবে। ইসলাম যে পথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনধারা চালাবার বিধান দিয়েছে তোমাদের সে পথেই নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালিত করতে হবে।

৪৫. অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে এ প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন স্রষ্টা, রব, মাবুদ ও আনুগত্য গ্রহণকারী নেই। এ প্রকৃতির ওপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উচিত। যদি স্বেচ্ছাচারীভাবে চলার নীতি অবলম্বন করো তাহলে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যদি অন্যের বন্দেগীর শিকল নিজের গলায় পরে নাও তাহলেও নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করবে।

এ বিষয়বস্তুটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء

"মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশু আসলে মানবিক প্রকৃতির ওপরই জন্ম লাভ করে। তারপর তার মা-বাপই তাকে পরবর্তীকালে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।"

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন প্রত্যেকটি পশুর পেট থেকে পুরোপুরি নিখুঁত ও সুস্থ পশুই বের হয়ে আসে। কোন একটা বাচ্চাও কান কাটা অবস্থায় বের হয়ে আসে না। পরে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে তার কান কেটে দেয়।

মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ীতে আর একটি হাদীস আছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ এক যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের শিশু সন্তানদেরকেও হত্যা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

ما بال اقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية

"লোকদের কি হয়ে গেছে, আজ তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং শিশুদেরকেও হত্যা করেছে?"

একজন জিজ্ঞেস করলো, এরা কি মুশরিকদের সন্তান ছিল না? জবাবে তিনি বলেন ঃ

انها خياركم ابناء المشركين

"তোমাদের সর্বোত্তম লোকেরা তো মুশরিকদেরই আওলাদ।" তারপর বলেন ঃ

كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانها فابواها يهودانها او ينصرانها –

"প্রত্যেক প্রাণসত্তা প্রকৃতির ওপর জন্ম নেয়, এমনকি যখন কথা বলতে শেখে তখন তার বাপ-মা তাকে ইহুদী খৃষ্টানে পরিণত করে।"

অন্য একটি হাদীসে ইমাম আহমাদ (র) ঈযায ইবনে হিমার আল মুজাশি'য়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষণের মাঝখানে বলেন ঃ

ان ربى يقول انى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم انزل به سلطانا –

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

(প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও একথার ওপর) আল্লাহ অভিমুখী হয়ে[৪৮] এবং তাঁকে ভয় করো,[৪৯] আর নামায কায়েম করো[৫০] এবং এমন মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেয়ো না যারা নিজেদের আলাদা আলাদা দীন তৈরি করে নিয়েছে আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তারা মশগুল হয়ে আছে।[৫১]

"আমার রব বলেন, আমার সমস্ত বান্দাদেরকে আমি একনিষ্ঠ সত্যপথাশ্রয়ী করে সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে দীন থেকে বিপথগামী করে এবং তাদের জন্য আমি যা কিছু হালাল করে দিয়েছিলাম সেগুলোকে হারাম করে নেয় এবং তাদেরকে হুকুম দেয়, আমার সাথে এ জিনিসগুলোকে শরীক গণ্য করো, যেগুলোকে শরীক করার জন্য আমি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।"

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। কেউ চাইলেও এ কাঠামোয় কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ বান্দা থেকে অ-বান্দা হতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মানুষের ইলাহ হতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য যতগুলো উপাস্য তৈরি করে নিক না কেন, মানুষ যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় এ বাস্তব সত্যটি অকাট্য ও অবিচল রয়ে গেছে। মানুষ নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে যাকে ইচ্ছা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার ধারক গণ্য করতে পারে এবং যাকে চায় তাকে নিজের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার মালিক মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য এটিই যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। কেউ তাঁর মতো ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার শক্তিও আল্লাহ ছাড়া কারো নেই।

এ আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আল্লাহর তৈরি কাঠামোয় পরিবর্তন করা যাবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ যে প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাকে বিকৃত করা ও ভেঙে ফেলা উচিত নয়।

৪৭. অর্থাৎ শান্ত সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই সঠিক ও সহজ পথ।

৪৮. আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তিই স্বেচ্ছাচারিতার নীতি অবলম্বন করে নিজের প্রকৃত মালিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা যে ব্যক্তিই অন্যের বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে নিজের প্রকৃত রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার এ নীতি

পরিহার করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সে জন্মলাভ করেছে সেই এক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে তাকে ফিরে যেতে হবে।

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগরুক থাকতে হবে যে, যদি আল্লাহর জন্মগত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তার মোকাবিলায় স্বাধীনতার নীতি অবলম্বন করে থাকো, অথবা তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো বন্দেগী করে থাকো, তাহলে এ বিশ্বাসঘাতকতা ও নিমকহারামির জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই তোমাদের এমন নীতি ও মনোভাব থেকে দূরে থাকা উচিত যা তোমাদের জন্য আল্লাহর আযাব ভোগ করাকে অবধারিত করে তোলে।

৫০. আল্লাহর দিকে ফেরা এবং তাঁর গযবের ভয় করা—এ দু'টিই মানসিক কর্ম। এ মানসিক অবস্থাটির প্রকাশ এবং এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে এমন কোন দৈহিক কর্মের প্রয়োজন যার মাধ্যমে বাইরেও প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে ওমুক ব্যক্তি যথার্থই এক ও লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে এসেছে। মানুষের নিজের মনের মধ্যেও এ আল্লাহ ভীতির দিকে ফিরে আসার অবস্থাটি একটি কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনবরত বিকাশ লাভ করতে থাকবে। তাই মহান আল্লাহ এই মানসিক পরিবর্তনের হুকুম দেবার পর সাথে সাথেই এ দৈহিক কর্ম অর্থাৎ নামায কায়েম করার হুকুম দেন। মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন চিন্তা নিছক চিন্তার পর্যায়েই থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। এ চিন্তায় ভাটা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে এবং চিন্তায় পরিবর্তন আসারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন সে সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তখন তার মধ্যে এ চিন্তা শিকড় গেড়ে বসে যেতে থাকে এবং যতই সে তদনুযায়ী কাজ করতে থাকে ততই তার শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা বেড়ে যেতে থাকে। এমনকি এ আকীদা ও চিন্তা পরিবর্তিত হওয়া এবং এতে ভাটা পড়ে যাওয়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া এবং আল্লাহ ভীতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার চাইতে বেশী কার্যকর আর কোন কাজ নেই। কারণ অন্য যে কোন কাজই হোক না কেন তা বিলম্বে আসে অথবা নামায এমন একটি কাজ যা নিয়মিতভাবে কয়েক ঘন্টা পরপর একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে মানুষকে স্থায়ীভাবে পালন করতে হয়। কুরআন ঈমান ও ইসলামের পূর্ণাংগ যে পাঠ মানুষকে দিয়েছে তা যাতে সে ভুলে না যায় এ জন্য বারবার মানুষকে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তাছাড়া মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কারা বিদ্রোহের নীতি পরিহার করে রবের প্রতি আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছে, কাফের ও মু'মিন সমাজ উভয়ের সামনে একথা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। মু'মিনদের কাছে একথা এ জন্য প্রকাশ হওয়া দরকার যে, এর ফলে তাদের একটি সমাজ ও দল গঠিত হতে পারে। তারা আল্লাহর পথে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। ঈমান ও ইসলামের সাথে যখনই তাদের দলের কোন ব্যক্তির সম্পর্ক ঢিলা হয়ে যেতে থাকে তখনই কোন সুস্পষ্ট আলামত সংগে সংগেই সমগ্র মু'মিন সমাজকে তার অবস্থা জানিয়ে দেয়। কাফেরদের কাছে এর প্রকাশ হওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে, এর ফলে তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে থাকা প্রকৃতি তার নিজের শ্রেণী মানুষদেরকে আসল ইলাহ রব্বুল আলামীনের দিকে বারবার ফিরে আসতে দেখে জেগে উঠবে এবং যতক্ষণ তারা জাগবে না ততক্ষণ আল্লাহর অনুগতদের কর্ম তৎপরতা দেখে তাদের মধ্যে ভীতি ও

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকতে থাকে[৫২] তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়,[৫৩] যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। বেশ, ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি কি তাদের কাছে কোন প্রমাণপত্র ও দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শিরকের সত্যতার সাক্ষ দেয়?[৫৪]

আতংক সৃষ্টি হতে থাকবে। এ দু'টি উদ্দেশ্যের জন্যও নামায কায়েম করাই হবে সবচেয়ে বেশী উপযোগী মাধ্যম।

এ প্রসংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, নামায কায়েম করার এ হুকুমটি মক্কা মু'আযযমায় এমন এক যুগে দেয়া হয় যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানের ক্ষুদ্র দলটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের জুলুম ও নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল এবং এরপরও ন' বছর পর্যন্ত এ নিষ্পেষণের ধারা অব্যাহত ছিল। সে সময় দূরের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাম নিশানা ছিল না। যদি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায অর্থহীন হয়ে থাকে, যেমন কতিপয় নাদান মনে করে থাকেন, অথবা ইকামতে সালাত অর্থ আদতে নামায কায়েম করা না হয়ে থাকে বরং "রবুবিয়াত ব্যবস্থা" পরিচালনা হয়ে থাকে, যেমন হাদীস অস্বীকারকারীরা দাবী করে থাকেন, তাহলে এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ ধরনের হুকুম দেয়ার অর্থ কি? আর এ হুকুম আসার পর ৯ বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা এ হুকুমটি কিভাবে পালন করতে থাকেন?

৫১. ওপরে যে প্রাকৃতিক দীনের কথা বলা হয়েছে মানব জাতির আসল দীনই হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক দীন, এখানে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। এ দীন মুশরিকী ধর্ম থেকে ক্রম–বিবর্তনের মাধ্যমে তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছেনি। যেমন আন্দাজ অনুমানের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় দর্শন রচনাকারীরা মনে করে থাকেন। বরং দুনিয়ায় যতগুলো ধর্ম পাওয়া যায় এ সবেরই উৎপত্তি হয়েছে এ আসল দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে। এ বিকৃতি আসার কারণ হলো এই যে, বিভিন্ন ব্যক্তি প্রাকৃতিক সত্যের ওপর নিজেদের নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জন্য এক একটি আলাদা ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই মূল সত্যের পরিবর্তে এ বর্ধিত জিনিসেরই ভক্ত অনুরক্ত হয়ে গেছে। যার ফলে তারা

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

যখন আমি লোকদেরকে দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যেতে থাকে।[৫৫] এরা কি দেখে না আল্লাহই যাকে চান তার রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকীর্ণ করেন (যাকে চান)? অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শনাবলী এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।[৫৬]

অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র ফিরকায় পরিণত হয়েছে। এখন সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করতে চাইলে যে প্রকৃত সত্য ছিল সত্য দীনের মূল ভিত্তি, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেদিকে ফিরে যেতে হবে। পরবর্তীকালের যাবতীয় বর্ধিত অংশ থেকে এবং তাদের ভক্ত–অনুরক্তদের দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারেই আলাদা হয়ে যেতে হবে। তাদের সাথে তারা যে সম্পর্ক সূত্রই কায়েম রাখবে সেটিই তাদের দীনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হবে।

৫২. তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে তাওহীদের প্রমাণ রয়ে গেছে একথাটিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেসব সহায়কের ভিত্তিতে আশার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল যখনই সেগুলো ভেঙে পড়তে থাকে তখনই তাদের অন্তর ভেতর থেকেই স্বতস্ফূর্তভাবে এই বলে চিৎকার করতে থাকে যে, বিশ্ব–জাহানের মালিকই আসল শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তাঁরই সাহায্যে তারা নিজেদের ধ্বংসরোধ ও ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

৫৩. অর্থাৎ অন্যান্য উপাস্যদেরকে মানত ও নযরানা পেশ করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এই সংগে একথাও বলা হতে থাকে যে, ওমুক হযরতের বদৌলতে এবং ওমুক মাজারের অনুগ্রহে এ বিপদ সরে গেছে।

৫৪. অর্থাৎ কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানতে পারলো যে, আপদ–বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন না বরং এসব বানোয়াট উপাস্যরা রক্ষা করে থাকে? বুদ্ধিবৃত্তি কি এর সাক্ষ দেয়? অথবা আল্লাহর এমন কোন কিতাব আছে কি যার মধ্যে তিনি বলেছেন, আমি আমার সার্বভৌম কর্তৃত্ব অমুক অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছি, এখন থেকে তারাই তোমাদের সমস্ত কাজ করে দেবে?

৫৫. ওপরের আয়াতে মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা, এবং তার অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল। এ আয়াতে মানুষের হীন প্রবৃত্তি ও তার সংকীর্ণমনতার জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। এ হীনচেতা কাপুরুষটি যখন

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾

কাজেই (হে মু'মিন!) আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (দাও তাদের অধিকার)।[৫৭] এ পদ্ধতি এমন লোকদের জন্য ভালো যারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম হবে।[৫৮] যে সূদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না।[৫৯] আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।[৬০]

দুনিয়ায় কিছু ধন-সম্পদ, শক্তি ও মর্যাদা লাভ করে এবং দেখে তার কাজ খুব ভালোভাবে চলছে তখন এ সবকিছু যে মহান আল্লাহর দান, একথা আর তার একদম মনে থাকে না। তখন সে মনে করতে থাকে, তার মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে যার ফলে সে এমন কিছু লাভ করেছে যা থেকে অন্যেরা বঞ্চিত হয়েছে। এ বিভ্রান্তির মধ্যে অহংকার ও আত্মগরিমার নেশায় সে এমনই বিভোর হয়ে যায় যার ফলে সে আল্লাহ ও সৃষ্টি কাউকেও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না। কিন্তু যখনই সৌভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং দুর্ভাগ্যের একটিমাত্র আঘাতই তার হৃদয়বৃত্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়। তখন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, হীনতম কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যাও করে বসে।

৫৬. অর্থাৎ মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর কুফরী ও শিরক কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এর বিপরীত পক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক পরিণাম কি, মু'মিনরা এ থেকে সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তিই নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকেই রিযিকের সমুদয় ভাণ্ডারের মালিক মনে করে, সে কখনো আল্লাহকে ভুলে থাকা লোকদের মতো সংকীর্ণ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। সে প্রসারিত রিযিক লাভ করলে অহংকারে মত্ত হয় না। বরং আল্লাহর শোকর আদায় করে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা ও ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না। সংকীর্ণ জীবিকা লাভ করুক বা অনাহারে থাকুক সর্বাবস্থায় সে সবর করে, কখনো বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না এবং শেষ সময় পর্যন্ত আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আশায় বসে থাকে। কোন নাস্তিক বা মুশরিক এ নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

৫৭. আত্মীয়–স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরকে দান–খয়রাত করার কথা বলা হয়নি। বরং বলা হচ্ছে, এ তার অধিকার এবং অধিকার মনে করেই তোমাদের এটা দেয়া উচিত। এ অধিকার দিতে গিয়ে যেন তোমার মনে এ ধারণা না জন্মে যে, তার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করছো এবং তুমি কোন মহান দানশীল সত্ত্বা আর সে কোন একটি সামান্য ও নগণ্য সৃষ্টি, তোমার অনুগ্রহের কণা ভক্ষণ করেই সে জীবিকা নির্বাহ করে। বরং একথা ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে যাওয়া উচিত যে, সম্পদের আসল মালিক যদি তোমাকে বেশী এবং অন্য বান্দাদেরকে কম দিয়ে থাকেন, তাহলে এ বর্ধিত সম্পদ হচ্ছে এমন সব লোকের অধিকার যাদেরকে তোমার আওতাধীনে তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য দেয়া হয়েছে। তুমি তাদেরকে এ অধিকার দান করছো কি করছো না এটা তোমার মালিক দেখতে চান।

আল্লাহর এ ভাষণ এবং এর আসল প্রাণসত্ত্বা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা–ভাবনা করবে সে একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, কুরআন মজীদ মানুষের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে পথ নির্ধারণ করে সে জন্য একটি মুক্ত সমাজ ও মুক্ত অর্থনীতি (Free Economy) অপরিহার্য। এ উন্নতি এমন কোন সামাজিক পরিবেশে সম্ভবপর নয় যেখানে মানুষের মালিকানা অধিকার খতম করে দেয়া হয়, রাষ্ট্র সমস্ত উৎপাদন উপকররণের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যায় এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জীবিকা বন্টনের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী কর্মকর্তাদের করায়ত্ব থাকে। এমন কি কোন ব্যক্তি নিজের ওপর অন্যের কোন অধিকার চিহ্নিত করার পরও তা তাকে দিতে পারে না এবং অন্য ব্যক্তি কারো থেকে কিছু গ্রহণ করে তার জন্য নিজের মনের মধ্যে কোন শুভেচ্ছার অনুভূতি লালন করতে পারে না। এভাবে নির্ভেজাল কমিউনিষ্ট সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আজকাল আমাদের দেশে "কুরআনী রবুবীয়াত ব্যবস্থা"র গালভরা নাম দিয়ে জবরদস্তি কুরআনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এটা কুরআনের নিজস্ব পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত নৈতিক বৃত্তির বিকাশ ও উন্মেষ এবং ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও উন্নয়নের দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কুরআনের পরিকল্পনা এমন জায়গায় কার্যকর হতে পারে যেখানে ব্যক্তিরা সম্পদের কিছু উপায়–উপকরণের মালিক হয়, সেগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে এবং এরপর স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আন্তরিকতা সহকারে প্রদান করে। এ ধরনের সমাজে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে একদিকে সহানুভূতি, দয়া–মায়া, মমতা, ত্যাগ–তিতিক্ষা, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য পালন করার উন্নততর গুণাবলী সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং অন্যদিকে যেসব লোকের সাথে সদাচার করা হয় তাদের মনে সদাচারীদের জন্য শুভেচ্ছা ও অনুগৃহীত হবার মনোভাব এবং অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করার পবিত্র অনুভূতি বিকাশ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি আদর্শ ও মহৎ পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে অন্যায়ের পথ রুদ্ধ হওয়া এবং ন্যায়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া কোন স্বৈরাচারী শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয় না বরং লোকেরা নিজেদের আত্মিক শুদ্ধতা ও সদিচ্ছাবশেই এ দায়িত্ব মাথা পেতে নেয়।

৫৮. এর দ্বারা একথা বুঝানো হচ্ছে না যে, কেবলমাত্র মিসকীন, মুসাফির ও আত্মীয়–স্বজনদের অধিকার দিয়ে দিলেই সাফল্য লাভ করা যাবে এবং এ ছাড়া সাফল্য লাভ করার জন্য আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যেসব লোক এ

আল্লাহই[৬১] তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন।[৬২] তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে?[৬৩] পাক–পবিত্র তিনি এবং এরা যে শির্‌ক করে তার বহু উর্ধে তাঁর অবস্থান।

অধিকারগুলো জানে না এবং এগুলো প্রদান করে না তারা সাফল্য লাভ করবে না। বরং সাফল্য লাভ করবে এমনসব লোক যারা একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিকারগুলো জানে এবং এগুলো প্রদান করে।

৫৯. সুদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনসূচক কুরআনের এটিই প্রথম আয়াত। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তো একথা মনে করে সুদ দিয়ে থাকো যে, যাকে আমি এ অতিরিক্ত সম্পদ দিচ্ছি তার ধন–দওলত বেড়ে যাবে। কিন্তু আসলে আল্লাহর কাছে সুদের মাধ্যমে ধন–দওলত বৃদ্ধি হয় না বরং যাকাতের মাধ্যমে বৃদ্ধি হয়। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে যখন মদীনা তাইয়েবায় সুদ হারাম হবার হুকুম নাযিল করা হয় তখন সেখানে অতিরিক্ত একথা বলা হয়, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰو وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ "আল্লাহ সুদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং সাদকাকে বিকশিত করেন।" (পরবর্তী বিধানের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ১৩০ আয়াত এবং আল বাকারাহ, ২৭৫ থেকে ২৮১ আয়াত)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল বলেন, এখানে রিবা শব্দের মাধ্যমে এমন সুদের কথা বলা হয়নি যাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম করা হয়েছে বরং এমন ধরনের দান, তোহ্‌ফা ও হাদিয়াকে সুদ বলা হয়েছে যা গ্রহীতা পরবর্তীকালে ফেরত দেবার সময় তা বর্ধিত আকারে ফেরত দেবে, এরূপ সংকল্প সহকারে দেয়া হয়। অথবা একথা মনে করে দেয়া হয় যে, তা দাতার কোন ভালো কাজে লাগবে অথবা তার আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা দাতার নিজের জন্য ভালো হবে। এটি ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা), দ্বাহ্‌হাক (রা), কাতাদাহ, ইকরামাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী ও শা'বীর উক্তি। আর সম্ভবত তাঁরা এ ব্যাখ্যা এ জন্য করেছেন যে, আয়াতে এ কর্মের ফল হিসেবে কেবলমাত্র এতটুকু বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে এ সম্পদের মধ্যে কোন বৃদ্ধি হবে না। অথচ শরীয়াত যে সুদকে হারাম করে দিয়েছে যদি ব্যাপারটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট হতো তাহলে ইতিবাচকভাবে বলা হতো, আল্লাহর দরবারে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, না, শরীয়াত যে রিবাকে হারাম গণ্য করেছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। এ মত প্রকাশ করেছেন হযরত হাসান বাসরী ও সুদ্দী এবং আল্লামা আলূসীর

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।৬৪ (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে দেখো পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।৬৫

মতে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটিই। কারণ আরবী ভাষায় রিবা শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মুফাস্‌সির নিশাপুরীও এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন।

আমার মতেও এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই সঠিক। কারণ পরিচিত অর্থ পরিত্যাগ করার জন্য ওপরে প্রথম ব্যাখ্যার সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। সূরা রূম যে সময় নাযিল হয় সে সময় কুরআন মজীদ সুদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেনি। তার কয়েক বছর পর একথা ঘোষিত হয়। এ জন্য সে পূর্ব থেকেই মন-মানসিকতা তৈরি করার কাজে লিপ্ত হয়। মদের ব্যাপারেও পূর্বে শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয়েছিল যে, এটা পবিত্র রিযিক নয় (আন্ নাহ্‌ল, ৬৭ আয়াত)। তারপর বলা হয়, এর ক্ষতি এর লাভের চেয়ে বেশী (আল বাকারাহ, ২১৯)। এরপর হুকুম দেয়া হয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না (আন নিসা ৪৩)। তারপর এটিকে পুরোপুরি হারাম করার ঘোষণা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে এখানে সুদের ব্যাপারেও কেবলমাত্র এতটুকু বলেই থেমে যাওয়া হয়েছে যে, এটা এমন জিনিস নয় যার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি হয় বরং সম্পদ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি হয় যাকাতের মাধ্যমে। এরপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (আলে ইমরান, ১৩০) এবং সবশেষে সুদকেই চূড়ান্তভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে (আল বাকারাহ, ২৭৫)

৬০. এ বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যে ধরনের ঐকান্তিক সংকল্প, গভীর ত্যাগের অনুভূতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের প্রবল আকাংখা সহকারে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে অনুরূপভাবেই আল্লাহ তাকে বেশী বেশী প্রতিদানও দেবেন। তাই একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও দান করে তাহলে আল্লাহ তাকে বাড়িয়ে ওহোদ পাহাড়ের সমান করে দেন।

৬১. এখান থেকে আবার মুশরিকদেরকে বুঝাবার জন্য বক্তব্যের ধারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসেছে।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

কাজেই (হে নবী!) এই সত্য দীনে নিজের চেহারাকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিনের হটে যাওয়ার কোন পথ নেই তার আগমনের পূর্বে,[৬৬] সেদিন লোকেরা বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যে কুফরী করেছে তার কুফরীর শাস্তি সে-ই ভোগ করবে[৬৭] আর যারা সৎকাজ করেছে তারা নিজেদেরই জন্য সাফল্যের পথ পরিষ্কার করছে, যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। অবশ্যই তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

৬২. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের রিযিকের জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন এবং এমন ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে রিযিকের আবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যেকে কিছু না কিছু অংশ পেয়ে যায়।

৬৩. অর্থাৎ তোমাদের তৈরি করা উপাস্যদের মধ্যে কেউ কি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা? জীবন ও মৃত্যু দান করা কি কারো ক্ষমতার আওতাভুক্ত আছে? অথবা মরার পর সে আবার কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে? তাহলে তাদের কাজ কি? তোমরা তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন?

৬৪. এখানে আবার রোম ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল এবং যার আগুন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। "লোকদের স্বহস্তের উপার্জন" বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, ফাসেকী, অশ্লীলতা, জুলুম ও নিপীড়নের এমন একটি ধারা যা শিরক ও নাস্তিক্যবাদের আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার ফলে অনিবার্যভাবে মানবিক নৈতিক গুণাবলী ও চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। "হয়তো তারা বিরত হবে" এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে শাস্তি লাভ করার পূর্বে আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত নয় বরং কিছু খারাপ কাজের ফল এ জন্য ভোগ করান যে, এর ফলে সে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবে এবং নিজের চিন্তাধারার ভ্রান্তি অনুধাবন করে নবীগণ সবসময় মানুষের সামনে যে সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপন করে এসেছেন এবং যা গ্রহণ না করলে মানুষের কর্মধারাকে সঠিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই সেদিকে ফিরে আসবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে, এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۭ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে এই যে, তিনি বাতাস পাঠান সুসংবাদ দান করার জন্য[৬৮] এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে আপ্লুত করার জন্য। আর এ উদ্দেশ্যে যাতে নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলে[৬৯] এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো[৭০] আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমি তোমার পূর্বে রসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং তাঁরা তাদের কাছে আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[৭১] তারপর যারা অপরাধ করে[৭২] তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিই আর মু'মিনদেরকে সাহায্য করা ছিল আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

যেমন দেখুন, আত্ তাওবা, ১২৬; আর রা'আদ, ২১; আস্ সাজদাহ, ২১ এবং আত তূর, ৪৭ আয়াত।

৬৫. অর্থাৎ রোম ও ইরানের ধ্বংসকর যুদ্ধ আজ কোন নতুন দুর্ঘটনা নয়। বড় বড় জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী অতীত ইতিহাসের বিরাট অংশ জুড়ে আছে। আর যে দোষগুলো সেসব জাতির ধ্বংসের মূলে কাজ করেছে সেগুলোর মূলে ছিল এ শিরক এবং আজ এ শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে যাকে হটাবেন না এবং তিনি কারো জন্য এমন কোন তদবির করার অবকাশও রাখেননি যার ফলে তা হটে যেতে পারে।

৬৭. এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। একজন কাফের নিজের কুফরীর কারণে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এ বাক্যের মধ্যে তার সবগুলোরই সমাবেশ ঘটেছে। ক্ষতিকারক বস্তুর অন্য কোন বিস্তারিত তালিকাই এতটা ব্যাপক হতে পারে না।

৬৮. অর্থাৎ অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণের সুসংবাদ দেবার জন্য।

৬৯. এটি জাহাজ চলাচলে সহায়তা দানকারী অন্য এক ধরনের বাতাসের আলোচনা। প্রাচীনকালে বাতাসের সহায়তায় চলাচলকারী নৌযান ও জাহাজসমূহের সফর তো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাসের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রতিকূল বাতাস তাদের জন্য ছিল ধ্বংসের সূচনা। তাই বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের পর ঐ বাতাসের উল্লেখ করা হয়েছে একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

আল্লাহই বাতাস পাঠান ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবেই চান সেভাবে এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়েই চলছে। এ বারিধারা যখন তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়। অথচ তার অবতরণের পূর্বে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহের ফলগুলো দেখো, মৃত পতিত ভূমিকে তিনি কিভাবে জীবিত করেন,[৭৩] অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

৭০. অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফর করো।

৭১. অর্থাৎ এক ধরনের নিদর্শনাবলী তো বিশ্ব-প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কাজে কর্মে প্রায় সর্বত্রই সেগুলোর সাথে মানুষের সংযোগ ঘটে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা। ওপরের আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য এক ধরনের নিদর্শনাবলী আল্লাহর নবীগণ মু'জিযা, আল্লাহর বাণী, নিজেদের অসাধারণ পবিত্র চরিত্র এবং মানব সমাজে নিজেদের জীবনদায়ী প্রভাবের আকারে নিয়ে এসেছেন। এ দু'ধরনের নিদর্শন আসলে একটি সত্যের প্রতিই ইংগিত করে। তা হচ্ছে, নবীগণ যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই সঠিক। তার মধ্যে প্রত্যেকটি নিদর্শনই অন্যটির সমর্থক। বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী নবীগণের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে এবং নবীগণ যেসব নিদর্শন এনেছেন সেগুলো বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী যে সত্যের প্রতি ইংগিত করছে সেগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়।

৭২. অর্থাৎ এ দু'টি নিদর্শন থেকে চোখ বন্ধ করে তাওহীদ অস্বীকার করার ওপর অবিচল থাকে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করে যেতে থাকে।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

আর যদি আমি এমন একটি বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা দেখে তাদের শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে[৭৪] তাহলে তো তারা কুফরী করতে থাকে।[৭৫] (হে নবী!) তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না,[৭৬] এমন বধিরদেরকেও নিজের আহবান শুনাতে পারো না যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে[৭৭] এবং অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে সঠিক পথ দেখাতে পারো না।[৭৮] তুমি তো একমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্যের শির নত করে।

৭৩. এখানে যেভাবে একের পর এক নবুওয়াত ও বৃষ্টির আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এ সত্যটির প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও পাওয়া যায় যে, নবীর আগমনও মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য ঠিক তেমনি অনুগ্রহস্বরূপ যেমন বৃষ্টির আগমন তার বৈষয়িক জীবনের জন্য অনুগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। আকাশ থেকে বারিধারা নেমে আসার ফলে যেমন মৃত পতিত জমি অকস্মাত জীবিত হয়ে ওঠে এবং তার চতুর্দিক শস্য শ্যামলিমায় ভরে যায়, ঠিক তেমনি আসমানী অহী অবতীর্ণ হওয়ার ফলে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরাণ দুনিয়া সজীব হয়ে ওঠে এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও প্রশংসিত আচার আচরণের উদ্যানগুলো পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হতে থাকে। এটা কাফেরদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিয়ামত যখনই তাদের কাছে আসে, তারা তা অস্বীকার করে এবং তাকে নিজেদের জন্য রহমতের সুসংবাদ মনে করার পরিবর্তে মৃত্যুর বারতা মনে করতে থাকে।

৭৪. অর্থাৎ রহমতের বারিধারার পরে যখন শস্যক্ষেত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে তখন যদি এমন কোন কঠিন শৈত্য বা উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ চলে, যার ফলে পাকা শস্য একেবারে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ তখন তারা আল্লাহর কুৎসা গাইতে এবং তাঁকে দোষারোপ করতে থাকে এই বলে যে, আমাদের ওপর এ কেমন বিপদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ যখন আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহধারা বর্ষণ করে চলছিলেন তখন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তাঁর অমর্যাদা করেছিল। এখানে আবার এ বিষয়বস্তুর প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহর রসূল তাঁর পক্ষ থেকে রহমতের পয়গাম নিয়ে আসেন

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৬ রুকূ'

আল্লাহই দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর এ দুর্বলতার পরে তোমাদের শক্তি দান করেন, এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন; তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[৭৯] আর তিনি সবকিছু জানেন, সব জিনিসের ওপর তিনি শক্তিশালী। আর যখন সেই সময় শুরু হবে,[৮০] যখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা তো মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করিনি।[৮১] এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে প্রতারিত হতো।[৮২] কিন্তু যাদেরকে ঈমান ও জ্ঞানের সম্পদ দান করা হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লিখিত বিধানে হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো, কাজেই এটিই সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা জানতে না। কাজেই সেদিন জালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা চাইতেও বলা হবে না।[৮৩]

তখন লোকেরা তাঁর কথা মেনে নেয় না এবং সেই নিয়ামত প্রত্যাখ্যান করে। তারপর যখন তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ জালেম ও স্বৈরাচারী একনায়কদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেন এবং তারা জুলুম-নিপীড়নের যাঁতাকলে তাদেরকে পিষ্ট করতে এবং মানবতার নিকুচি করতে থাকে তখন তারাই আল্লাহকে গালি দিতে থাকে এবং তিনি এ কেমন জুলুমে পরিপূর্ণ দুনিয়া তৈরি করেছেন বলে দোষারোপও করতে থাকে।

৭৬. এখানে এমনসব লোককে মৃত বলা হয়েছে। যাদের বিবেক মরে গেছে, যাদের মধ্যে নৈতিক জীবনের ছিটেফোটাও নেই এবং যাদের আপন প্রবৃত্তির দাসত্ব, জিদ ও

একগুঁয়েমি সেই মানবীয় গুণপনার অবসান ঘটিয়েছে যা মানুষকে হক কথা বুঝার ও গ্রহণ করার যোগ্য করে তোলে।

৭৭. বধির হচ্ছে এমনসব লোক যারা নিজেদের মনের দুয়ার এমনভাবে অর্গলবদ্ধ করেছে যে, সবকিছু শুনেও তারা কিছুই শুনে না। তারপর এ ধরনের লোকেরা যখন এমন প্রচেষ্টাও চালায় যাতে সত্যের আহবানের ধ্বনি তাদের কানে পৌছুতেই না পারে এবং আহবায়কের চেহারা দেখতেই দূরে সরে যেতে থাকে তখন আর কে তাদেরকে শুনাবে এবং কী–ই বা শুনাবে?

৭৮. অর্থাৎ অন্ধদের হাত ধরে তাদেরকে সারা জীবন সঠিক পথে চালানো তো নবীর কাজ নয়। তিনি তো কেবল সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যাদের দেখার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং নবী তাদেরকে যে পথ দেখাতে চাচ্ছেন তা যারা দেখতেই পায় না তাদেরকে পথ দেখানোর ক্ষমতা নবীর নেই।

৭৯. অর্থাৎ শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এসব অবস্থা তাঁরই সৃষ্ট। তিনি যাকে চান দুর্বল করে সৃষ্টি করেন, যাকে চান তাকে শক্তিশালী করেন, যাকে চান তাকে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেন না, যাকে চান তাকে যৌবনে মৃত্যু দান করেন, যাকে চান তাকে দীর্ঘ বয়স দান করার পরও সুস্থ সবল রাখেন, যাকে চান তাকে গৌরবান্বিত যৌবনকালের পরে বার্ধক্যে এমন কষ্টকর পরিণতি দান করেন যার ফলে দুনিয়াবাসী শিক্ষালাভ করে, এসবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিজের জায়গায় বসে যতই অহংকারে মত্ত হয়ে উঠুক না কেন আল্লাহর শক্তির শৃংখলে সে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, আল্লাহ তাকে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

৮০. অর্থাৎ কিয়ামত যার আসার খবর দেয়া হচ্ছে।

৮১. অর্থাৎ মৃত্যুকাল থেকে কিয়ামতের এই সময় পর্যন্ত। এ দু'টি সময়ের মধ্যে দশ বিশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তারা মনে করবে তারা যেন এই মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ঘুমিয়েছিল এবং এখন অকস্মাত একটি দুর্ঘটনা তাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে।

৮২. অর্থাৎ দুনিয়াতেও তারা এমনিই ভুল আন্দাজ–অনুমান করতো। সেখানেও সত্য অনুধাবন করতে পারতো না। এ জন্যই বলে বেড়াতো, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না, মরার পরে আর কোন জীবন নেই এবং কোন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না।

৮৩. এর অন্য অনুবাদ এও হতে পারে যে, "তাদের কাছে চাওয়া হবে না যে, তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করো" কারণ তাওবা, ঈমান ও সৎকাজের দিকে ফিরে আসার সকল সুযোগই তারা হারিয়ে বসবে এবং পরীক্ষার সময় পার হয়ে গিয়ে এখনি ফল প্রকাশের সময় সমাগত হবে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। তুমি যে কোন নিদর্শনই আনো না কেন, অবিশ্বাসীরা একথাই বলবে, তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী। এভাবে যারা জ্ঞানহীন তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। কাজেই (হে নবী!) সবর করো, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য[৮৪] এবং যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে।[৮৫]

৮৪. ওপরে ৪৭ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে মহান আল্লাহ নিজের এ নিয়ম বর্ণনা করেছেন যে, যারাই আল্লাহর রসূলদের নিয়ে আসা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শনের মোকাবিলা করেছে মিথ্যাচার, হাসি-তামাশা ও হঠকারিতার মাধ্যমে, আল্লাহ অবশ্যই এ ধরনের অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا আর আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করবেন এটা তার ওপর মু'মিনদের অধিকার وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ।

৮৫. অর্থাৎ শত্রুরা যেন তোমাদের এতই দুর্বল না পায় যে, তাদের হৈ চৈ ও শোরগোলে তোমরা দমিত হবে অথবা তাদের মিথ্যাচার ও দোষারোপ করার অভিযান দেখে তোমরা ভীত হয়ে যাও কিংবা হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ হয়ে তোমরা হিম্মত হারিয়ে ফেলো অথবা তাদের হুমকি-ধমকি ও শক্তি প্রকাশে এবং জুলুম নির্যাতনে তোমরা ভীত হয়ে যাও কিংবা তাদের ফেলা লালসার টোপে তোমরা আটকা পড়ে যাও অথবা জাতীয় স্বার্থের নামে তারা তোমাদের কাছে যে আবেদন জানাচ্ছে তার ভিত্তিতে তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করে নিতে উদ্যত হও। এর পরিবর্তে তারা তোমাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সচেতনতায় এত বেশী সতর্ক এবং নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে এত বেশী পাকাপোক্ত এবং এ সংকল্পে এত বেশী দৃঢ়চেতা এবং নিজেদের চরিত্রে এতবেশী মজবুত পাবে যে, কোন ভয়ে তোমাদের ভীত করা যাবে না, কোন মূল্যে তোমাদের কেনা যাবে না, কোন প্রতারণা জালে তোমাদের আবদ্ধ করা যাবে না, কোন ক্ষতি, কষ্ট বা বিপদে ফেলে তোমাদেরকে পথ থেকে সরানো যাবে না এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ বা লেনদেনের কারবারও তোমাদের সাথে করা যেতে পারে না। "অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে"— আল্লাহর এ ছোট্ট একটি বাণীর আলংকারিক বাক-বিন্যাসের মধ্যেই এ সমস্ত বিষয়বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যেমন শক্তিশালী ও গুরুত্বহ দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি ঠিক তেমনটি হতে পেরেছিলেন কিনা এখন ইতিহাসই তা প্রমাণ করবে। তাঁর সাথে যে ব্যক্তিই যে ময়দানে শক্তি পরীক্ষা করেছে সেই ময়দানেই সে হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত এ মহান ব্যক্তিত্ব এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন যার পথরোধ করার জন্য আরবের কাফের ও মুশরিক সমাজ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ ও সমস্ত কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে।

লুক্‌মান

৩১

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ'তে লুকমান হাকীমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সুবাদে এ সূরার লুকমান নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন ইসলামের দাওয়াতের কন্ঠরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং এ জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিল। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। ১৪ ও ১৫ আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নেবে না। একথাটাই সূরা আনকাবূতেও বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাযিল হয়। কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথমে নাযিল হয়। কারণ এর পশ্চাতভূমে কোন তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা আনকাবূত পড়লে মনে হবে তার নাযিলের সময় মুসলমানদের ওপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় লোকদের বুঝানো হয়েছে, শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা। এই সংগে আহবান জানানো হয়েছে এই বলে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা পেশ করছেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা করো এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখো, বিশ্ব-জগতের চারদিকে এবং নিজের মানবিক সত্তার মধ্যেই কেমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন এর সত্যতার সাক্ষ দিয়ে চলছে।

এ প্রসংগে একথাও বলা হয়েছে, দুনিয়ায় বা আরবদেশে এই প্রথমবার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি আওয়াজ উঠানো হয়নি। আগেও লোকেরা বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং তারা একথাই বলতো যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তোমাদের নিজেদের দেশেই ছিলেন মহাজ্ঞানী লুকমান। তাঁর জ্ঞান-গরিমার কাহিনী তোমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথাবার্তায় তাঁর প্রবাদ বাক্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা উদ্ধৃত করে থাকো। তোমাদের কবি ও বাগ্মীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কথা বলেন। এখন তোমরা নিজেরাই দেখো তিনি কোন্ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও কোন্ ধরনের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন।

الٓمّٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

আলিফ লাম মীম। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।[১] পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য[২] যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে।[৩] এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সাফল্য লাভ করবে।[৪]

১. অর্থাৎ এমন কিতাবের আয়াত যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যার প্রত্যেকটি কথা জ্ঞানগর্ভ।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো সঠিক পথনির্দেশক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহের রূপলাভ করে এসেছে। কিন্তু এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ থেকে লাভবান হয় একমাত্র তারাই যারা সৎকাজ করার পথ অবলম্বন করে, সৎ হতে চায়, কল্যাণ ও ন্যায়ের সন্ধান করে এবং অসৎকাজ সম্পর্কে যখনই সতর্ক করে দেয়া হয় তখনই তা পরিহার করে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ যখনই সামনে খুলে রেখে দেয়া হয় তখনই সে পথে চলতে শুরু করে। আর যারা অসৎকাজ করে ও অসৎ মনোবৃত্তির অধিকারী তারা এ পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবে না এবং এ অনুগ্রহেরও কোন অংশ পাবে না।

৩. যাদেরকে সৎকর্মশীল বলা হয়েছে তারা কেবলমাত্র এ তিনটি গুণাবলীর অধিকারী, একথা বলা হয়নি। আসলে প্রথমে 'সৎকর্মশীল' শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, এ কিতাব যেসব অপকর্মে বাধা দেয় এ সৎকর্মশীলরা সেসবগুলো থেকেই বিরত থাকে। আর এ কিতাব যেসব সৎকাজ করার হুকুম দেয় এরা সেসবগুলোই করে। তারপর এ "সৎকর্মশীলদের" তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, বাদবাকি সমস্ত সৎকাজ কিন্তু এ তিনটি সদগুণের ওপরই নির্ভর করবে। তারা নামায কায়েম করে। এর ফলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া তাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা যাকাত দেয়। এর ফলে আত্মত্যাগের প্রবণতা তাদের মধ্যে সুদৃঢ়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে,[৫] যে মনোমুগ্ধকর কথা[৬] কিনে আনে লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই[৭] আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহবানকে হাসি–ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়।[৮] এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।[৯] তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড়ই দর্পভরে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনেইনি, যেন তার কান কালা। বেশ, সুখবর শুনিয়ে দাও তাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত,[১০] যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[১১]

ও শক্তিশালী হয়, পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহ প্রদমিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা জেগে ওঠে। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগে। এর বদৌলতে তারা এমন জন্তু–জানোয়ারের মতো হয় না যারা চারণক্ষেত্রে বাঁধনহারা হয়ে এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। বরং তারা এমন মানুষদের মতো হয়ে যায় যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। মনে করে, তারা কোন প্রভুর গোলাম এবং নিজেদের সমস্ত কাজের জন্য প্রভুর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ তিনটি বিশেষত্বের কারণে এ "সৎকর্মশীলরা" ঠিক তেমনি ধরনের সৎকর্মশীল থাকে না যারা ঘটনাক্রমে কোন সৎকাজ করে বসে এবং তাদের অসৎকাজও তেমনি সৎকাজের মতো একই ধারায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিশেষত্বগুলো তাদের মধ্যে একটি চিন্তা ও নৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় যার ফলে তাদের সৎকাজগুলো একটি ধরা বাঁধা নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং অসৎকাজ যদি কখনো হয়ে যায়ই তাহলে তা হয় ঘটনাক্রমে। তাদের কোন গভীর চিন্তা ও নৈতিক উদ্যোগ তাদেরকে নিজেদের প্রাকৃতিক চাহিদা অনুসারে অসৎপথে নিয়ে যায় না।

৪. যে সময় এ আয়াত নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেররা মনে করতো এবং প্রকাশ্যে বলতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর এ দাওয়াত গ্রহণকারী

লোকেরা নিজেদের জীবন ধ্বংস করে চলছে। তাই একেবারে নির্দিষ্ট করে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "এরাই সফলকাম হবে।" অর্থাৎ এরা ধ্বংস হবে না, যেমন বাজে ও উদ্ভট চিন্তার মাধ্যমে তোমরা মনে করে বসেছো। বরং এরাই আসলে সফলকাম হবে এবং যারা এপথ অবলম্বন করতে অস্বীকার করেছে তারাই হবে অকৃতকার্য।

এখানে যে ব্যক্তি সাফল্যকে শুধুমাত্র এ দুনিয়ার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাও আবার বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করবে, কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার ব্যাপারে সেও মারাত্মক ভুল করবে। সাফল্যের কুরআনী ধারণা জানার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতগুলো তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা সহকারে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। আল বাকারা, ২–৫; আলে ইমরান, ১০৩, ১৩০ ও ২০০; আল মা–য়েদাহ, ৩৫ ও ৯০; আল আন'আম, ২১; আল 'আরাফ, ৭–৮ ও ১৫৭; আত্ তাওবাহ, ৮৮; ইউনুস, ১৭; আন্ নাহ্‌ল, ১১৬; আল হাজ্জ, ৭৭; আল মু'মিনূন, ১ ও ১১৭; আন নূর, ৫১; এবং আর রূম, ৪৮ আয়াত।

৫. অর্থাৎ একদিকে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ এসেছে, যা থেকে কিছু লোক লাভবান হচ্ছে। অন্যদিকে ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান লোকদের পাশাপাশি এমন দুর্ভাগা লোকেরাও রয়ে গেছে যারা আল্লাহর আয়াতের মোকাবিলায় এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

৬. আসল শব্দ হচ্ছে "লাহ্‌ওয়াল হাদীস" অর্থাৎ এমন কথা যা মানুষকে আত্ম–সমাহিত করে অন্য প্রত্যেকটি জিনিস থেকে গাফিল করে দেয়। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দগুলোর মধ্যে নিন্দার কোন বিষয় নেই। কিন্তু খারাপ, বাজে ও অর্থহীন কথা অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন গালগল্প, পুরাকাহিনী, হাসি–ঠাট্টা, কথা–কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, গান বাজনা এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য জিনিস।

'লাহ্‌ওয়াল হাদীস' কিনে নেয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বাদ দিয়ে মিথ্যা কথা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন কথার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় যার মাধ্যমে তার জন্য দুনিয়াতেও কোন মংগল নেই এবং আখেরাতেও নেই। কিন্তু এটি এই বাক্যাংশটির রূপক অর্থ। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, মানুষ তার নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কোন বাজে জিনিস কিনে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। ইবনে হিশাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, মক্কার কাফেরদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন এ দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েই চলছিল তখন নদ্বর ইবনে হারেস কুরাইশ নেতাদেরকে বললো, তোমরা যেভাবে এ ব্যক্তির মোকাবিলা করছো, তাতে কোন কাজ হবে না। এ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যেই জীবন যাপন করে শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। আজ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সে ছিল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। এখন তোমরা বলছো, সে গণক, যাদুকর, কবি, পাগল। একথা কে বিশ্বাস করবে? যাদুকর কোন্ ধরনের তুক্‌তাক কারবার চালায় তা কি লোকেরা জানে না? গণকরা কি সব কথাবার্তা বলে তা কি লোকদের জানতে বাকি আছে? লোকেরা কি কবি ও কবিতা চর্চার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ? পাগলরা কেমন কেমন করে তাকি লোকেরা জানে না? এ দোষগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ওপর

প্রযোজ্য হয় যে, সেটি বিশ্বাস করার জন্য তোমরা লোকদেরকে আহবান জানাতে পারবে? থামো, এ রোগের চিকিৎসা আমিই করবো। এরপর সে মক্কা থেকে ইরাক চলে গেলো। সেখান থেকে অনারব বাদশাহদের কিস্‌সা কাহিনী এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের গল্পকথা সংগ্রহ করে এনে গল্প বলার আসর জমিয়ে তুলতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে লোকেরা কুরআনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এসব গল্প-কাহিনীর মধ্যে ডুবে যাবে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ) আসবাবুন নযুলের মধ্যে এ বর্ণনাটি ওয়াহেদী কাল্‌বী ও মুকাতিল থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, নদ্বর এ উদ্দেশ্যে গায়িকা বাঁদীদেরকেও কিনে এনেছিল। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় প্রভাবিত হতে চলেছে বলে তার কাছে খবর এলেই সে তার জন্য নিজের একজন বাঁদী নিযুক্ত করতো এবং তাকে বলে দিতো ওকে খুব ভালো করে পানাহার করাও ও গান শুনাও এবং সবসময় তোমার সাথে জড়িয়ে রেখে ওদিক থেকে ওর মন ফিরিয়ে আনো। বিভিন্ন জাতির বড় বড় অপরাধীরা প্রত্যেক যুগে যেসব ধূর্তামী ও চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে এসেছে এ প্রায় সে একই ধরনের চালবাজী ছিল। তারা জনগণকে খেলা-তামাশা ও নাচগানে (কালচার) মশগুল করতে থাকে। এভাবে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি নজর দেবার চেতনাই থাকে না এবং এ অস্তিত্ব জগতের মধ্যে তারা একথা অনুভবই করতে পারে না যে, তাদেরকে এক ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লাহ্‌ওয়াল হাদীসের এ ব্যাখ্যাই বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়, এ আয়াতে যে লাহ্‌ওয়াল হাদীস শব্দ এসেছে এর তাৎপর্য কি? তিনি তিনবার জোর দিয়ে বলেন, هو والله الغناء "আল্লাহর কসম এর অর্থ হচ্ছে গান।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবি শাইবাহ, হাকেম, বায়হাকী) প্রায় এ একই ধরনের উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, মুজাহিদ, ইকরামাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বাসরী ও মাকহূল থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও তিরমিযি হযরত আবু উমামাহ বাহেলীর (রা) হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤ هن ولا التجارة فيهن ولا اثما نهن

"গায়িকা মেয়েদের কেনাবেচা ও তাদের ব্যবসায় করা হালাল নয় এবং তাদের দাম নেয়াও হালাল নয়।"

অন্য একটি হাদীসে শেষ বাক্যটির শব্দাবলী হচ্ছে : اكل ثمنهن حرام "তাদের মূল্য খাওয়া হারাম।" অন্য একটি হাদীসে একই আবু উমামাহ থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী উদ্ধৃত হয়েছে :

لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤ هن وثمنهن حرام

"বাঁদীদেরকে গান–বাজনা করার শিক্ষা দেয়া এবং তাদের বেচা-কেনা করা হালাল নয় এবং তাদের দাম হারাম।"

এ তিনটি হাদীসে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, من يشترى لهو الحديث আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআনে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম মালেকের বরাত দিয়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من جلس الى قينة يسمع منها صب فى اذنيه الانك يوم القيمة

"যে ব্যক্তি গায়িকা বাঁদীর মাহফিলে বসে তার গান শুনবে, কিয়ামতের দিন তার কানে গরম শীসা ঢেলে দেয়া হবে।"

(এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, সে যুগে গান–বাজনার "সংস্কৃতি" বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বরং পুরোপুরি বাঁদীদের বদৌলতেই জীবিত ছিল। স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত মেয়েরা সেকালে "আর্টিষ্ট" হননি। তাই নবী (সা) গায়িকাদের কেনা–বেচার কথা বলেছেন, দাম শব্দের সাহায্যে তাদের "ফী"র ধারণা দিয়েছেন এবং গায়িকা মেয়েদের জন্য "কাইনা" শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় বাঁদীদের জন্য এ শব্দটি বলা হয়।)

৭. "জ্ঞান ছাড়াই" শব্দের সম্পর্ক "কিনে আনে" এর সাথেও হতে পারে আবার "বিচ্যুত করে" –এর সাথেও হতে পারে। যদি প্রথম বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, সেই মূর্খ অজ্ঞ লোক এই মনোমুগ্ধকর জিনিসটি কিনে নেয় এবং সে জানে না কেমন মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে সে কেমন ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে আছে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশনা সমৃদ্ধ আল্লাহর আয়াত। বিনামূল্যে সে তা লাভ করছে কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে সব অর্থহীন ও বাজে জিনিস। সেগুলো চিন্তা ও চরিত্রশক্তি ধ্বংস করে দেয়। নিজের টাকা পয়সা খরচ করে সে সেগুলো লাভ করছে। আর যদি একে দ্বিতীয় বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, সে জ্ঞান ছাড়াই লোকদের পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে সে যে নিজের ঘাড়ে কত বড় জুলুমের দায়ভাগ চাপিয়ে নিচ্ছে, তা সে জানে না।

৮. অর্থাৎ এ ব্যক্তি লোকদেরকে কিস্‌সা–কাহিনী ও গান–বাজনায় মশ্‌গুল করে আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ করতে চায়। সে কুরআনের এ দাওয়াতকে ঠাট্টা–তামাশার মধ্যে উড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহর দীনের সাথে লড়াই করার জন্য সে যুদ্ধের এমনসব নকশা তৈরি করতে চায় যেখানে একদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আয়াত শোনাতে বের হবেন, অন্যদিকে কোন সুশ্রী ও সুকণ্ঠী গায়িকার মাহফিল গুলজার হতে থাকবে, আবার কোথাও কোন বাচাল কথক ইরান–তূরানের কাহিনী শুনাতে থাকবে এবং লোকেরা এসব সাংস্কৃতিক তৎপরতায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে আল্লাহ, আখেরাত ও নৈতিক চরিত্রনীতির কথা শোনার মুডই হারিয়ে ফেলবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

তিনি[১২] আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও।[১৩] তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে।[১৪] তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং জমিতে নানা ধরনের উত্তম জিনিস উৎপন্ন করি। এতো হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এখন আমাকে একটু দেখাও তো দেখি অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে?[১৫]—আসল কথা হচ্ছে এ জালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।[১৬]

৯. এ শাস্তি তাদের অপরাধের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারিত। তারা আল্লাহর দীন, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে লাঞ্ছিত করতে চায়। এর বদলায় আল্লাহ তাকে কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাব দেবেন।

১০. তাদের জন্য জান্নাতের নিয়ামতসমূহ রয়েছে, একথা বলেননি। বরং বলেছেন, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। যদি প্রথম কথাটি বলা হতো, তাহলে এর অর্থ হতো, তারা এ নিয়ামতসমূহ উপভোগ করবে ঠিকই কিন্তু এ জান্নাতগুলো তাদের নিজেদের হবে না। এর পরিবর্তে "তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ" একথা বলায় আপনা-আপনি একথা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, জান্নাত পুরোটাই তাদের হাওয়ালা করে দেয়া হবে এবং তারা তার নিয়ামতসমূহ এমনভাবে ভোগ করতে থাকবে যেমন একজন মালিক তার মালিকানাধীন জিনিস ভোগ করে থাকে। মালিকানা অধিকার ছাড়াই কাউকে কোন জিনিস থেকে নিছক লাভবান হবার সুযোগ দিলে যেভাবে তা ভোগ করা হয় সেভাবে নয়।

১১. অর্থাৎ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন থেকে কোন জিনিসই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না এবং তিনি যা কিছু করেন ঠিকমতো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী অনুযায়ীই করেন। "এটা আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি"—একথা বলার পর আল্লাহর উপরোক্ত দু'টি বিশেষ গুণের কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একথা বলা যে, মহান আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না এবং এ বিশ্ব-জাহানে এমন কোন শক্তিই নেই যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে আল্লাহ যা কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কারো না পাওয়ার আশংকা নেই। তা ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পুরস্কারের ঘোষণা পুরোপুরি তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার

ওপর নির্ভরশীল। সেখানে হকদারকে বঞ্চিত করে নাহকদারকে দান করার কোন কারবার নেই। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকেরাই এ পুরস্কারের হকদার এবং আল্লাহ এ পুরস্কার তাদেরকেই দেবেন।

১২. ওপরের প্রস্তাবনা ও প্রারম্ভিক বাক্যগুলোর পর এখন আসল বক্তব্য অর্থাৎ শিরক খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত দেবার জন্য বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে।

১৩. মূল শব্দ হচ্ছে, بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا এর দু'টি মানে হতে পারে। একটি হচ্ছে, "তোমরা নিজেরাই দেখছো, স্তম্ভ ছাড়াই তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।" দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, "এমন সব স্তম্ভের ওপর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত যা চোখে দেখা যায় না" ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ এর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আবার মুফাস্‌সিরগণের অন্য একটি দল এর প্রথম অর্থটি নেন। বর্তমান যুগের পদার্থ বিদ্যার দৃষ্টিতে যদি এর অর্থ বর্ণনা করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে, সমগ্র আকাশ জগতে এ সীমা–সংখ্যাহীন বিশাল গ্রহ–নক্ষত্রপুঞ্জকে যার যার গতিপথে অদৃশ্য স্তম্ভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কোন তারের সাহায্যে তাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করে রাখা হয়নি। কোন পেরেকের সাহায্যে তাদের একটির অন্যটির ওপর উল্টে পড়ে যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখা হয়নি। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই এ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। আমাদের আজকের জ্ঞানের ভিত্তিতে এটিই আমাদের ব্যাখ্যা। হতে পারে আগামীকাল আমাদের জ্ঞান আরো কিছু বেড়ে যেতে পারে। তখন এর আরো কোন বেশী মানানসই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নাহ্‌ল, ১২ টীকা।

১৫. অর্থাৎ যেসব সত্তাকে তোমরা নিজেদের উপাস্য করে নিয়েছো, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ভাগ্যবিধাতা করে নিয়েছো এবং যাদের বন্দেগী ও পূজা করার জন্য তোমরা এত হন্যে হয়ে লেগেছো।

১৬. অর্থাৎ যখন এরা এ বিশ্ব–জাহানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন সৃষ্টি চিহ্নিত করতে পারেনি এবং একথা সুস্পষ্ট যে, তারা তা করতে পারে না তখন তাদের যারা স্রষ্টা নয় এমন সত্তাকে আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা, তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও অভাব মোচন করার জন্য আবেদন জানানোকে সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি একেবারেই উন্মাদ হয়ে না যায় ততক্ষণ সে এত বড় নির্বুদ্ধিতা করতে পারে না যে, সে কারো সামনে নিজেই নিজের উপাস্যদেরকে সৃষ্টিকর্মে অক্ষম বলে এবং একমাত্র আল্লাহকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করে নেবার পরও তাদেরকে উপাস্য বলে মেনে নেবার জন্য জিদ ধরবে। যার ঘটে একটুখানিও বুদ্ধি আছে সে কখনো চিন্তা করবে না, কোন জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতাই যার নেই এবং পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিসের সৃষ্টিতে যার নামমাত্র অংশও নেই সে কেন আমাদের উপাস্য হবে? কেন আমরা তার সামনে সিজদানত হবো? অথবা তার পদচুম্বন করবো এবং তার আস্তানায় গিয়ে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত করবো? আমাদের ফরিয়াদ শোনার এবং আমাদের অভাব পূরণ করার কী ক্ষমতা তার আছে? তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, সে আমাদের প্রার্থনা শুনছে কিন্তু তার জবাবে সে নিজে কি পদক্ষেপ নিতে পারে, যখন তার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই?

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আমি[১৭] লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।[১৮] যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।[১৯]

স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।[২০] যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম।"[২১]

যে কিছু করতে পারে সে-ই তো কিছু ভেঙ্গে যাওয়া জিনিস গড়তে পারে কিন্তু যার আদতে করারই কোন ক্ষমতা নেই সে আবার কেমন করে ভেঙে যাওয়া জিনিস গড়তে পারবে।

১৭. একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর এখন আরবের লোকদেরকে একথা জানানো হচ্ছে যে, এ যুক্তিসংগত কথা প্রথমবার তোমাদের সামনে তোলা হচ্ছে না বরং পূর্বেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা একথাই বলে এসেছেন এবং তোমাদের নিজেদের বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান আজ থেকে বহুকাল আগে একথাই বলে গেছেন। তাই শিরক যদি কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে কেউ একথা বলেনি কেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের জবাবে তোমরা একথা বলতে পারো না।

একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে আরবে লুকমান বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জাহেলী যুগের কবিরা যেমন ইমরাউল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ তাদের কবিতায় তার কথা বলা হয়েছে। আরবের কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে "সহীফা লুকমান" নামে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেতো। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মদীনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবনে সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় যান। সেখানে নবী করীম (সা) নিজের নিয়ম মতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের আবাসস্থলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ প্রসংগে সুওয়াইদ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা শুনেন, তাঁকে বলেন, আপনি যে ধরনের কথা বলছেন তেমনি ধরনের একটি

জিনিস আমার কাছেও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? জবাব দেন সেটা লুকমানের পুস্তিকা। তারপর নবী করীমের (সা) অনুরোধে তিনি তার কিছু অংশ পাঠ করে তাঁকে শুনান। তিনি বলেন, এটা বড়ই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে এর চেয়েও বেশী চমৎকার কথা আছে। এরপর কুরআন শুনান। কুরআন শুনে সুওয়াইদ অবশ্যই স্বীকার করেন, নিসন্দেহে এটা লুকমানের পুস্তিকার চেয়ে ভালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৬৭–৬৯ পৃঃ; উসুদুল গাবাহ, ২ খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সুওয়াইদ ইবনে সামেত তাঁর যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহিত্য ও কাব্য মনীষা এবং বংশ মর্যাদার কারণে মদীনায় "কামেল" নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর যখন তিনি মদীনায় ফিরে যান তার কিছুদিন পর বুয়াসের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে তিনি মারা যান। তাঁর গোত্রের লোকদের সাধারণভাবে এ ধারণা ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লুকমানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে কোন লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না। শত শত বছর থেকে মুখে মুখে শ্রুত যেসব তথ্য স্মৃতির ভাণ্ডারে লোককাহিনী–গল্প–গাথার আকারে সংগৃহীত হয়ে আসছিল সেগুলোর ওপর ছিল এর ভিত্তি। এসব বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ হযরত লুকমানকে আদ জাতির অন্তরভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাঁর 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হযরত হূদের (আ) সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত আবু হুরাইরা (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদুর রাব'ঈও একথাই বলেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ তিনটি বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সূদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই তিনটি উক্তিতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। তারপর রওদাতুল আনাফে সুহাইলির ও মুরূজুয যাহাবে মাস'উদীর বর্ণনা থেকে এ সূদানী গোলামের কথা আরবে কেমন করে ছড়িয়ে পড়লো এ প্রশ্নের ওপরও আলোকপাত হয়। এ উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি আসলে ছিলেন নূবী। কিন্তু তিনি বাসিন্দা ছিলেন মাদ্‌য়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। এ কারণে তাঁর ভাষা ছিল আরবী এবং তাঁর জ্ঞানের কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া সুহাইলী আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়। (রওদুল আনাফ, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা এবং মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

এখানে একথাটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচ্যবিদ ডিরেনবুর্গ (Derenbourg) প্যারিস লাইব্রেরীর যে আরবী পাণ্ডুলিপিটি "লুকমান হাকীমের গাথা" (Fables De Loqman Lo Sage) নামে প্রকাশ করেছেন সেটি আসলে বানোয়াট। "লুকমানের সহীফা''র সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতকে এ গাথাগুলো কেউ সংকলন করেছিলেন। তাঁর আরবী সংস্করণ বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলো পড়লে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, আসলে অন্যকোন ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর সম্পর্ক লুকমান হাকীমের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদরা এ ধরনের জাল ও বানোয়াট জিনিসগুলো বের করে যে উদ্দেশ্যে সামনে আনেন তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কুরআন বর্ণিত কাহিনীগুলোকে যে কোনভাবেই অনৈতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ করে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা। যে ব্যক্তিই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে "লুকমান" শিরোনামে (B. Heller) হেলারের নিবন্ধটি পড়বেন তাঁর কাছেই তাদের মনোভাব অস্পষ্ট থাকবে না।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টির প্রাথমিক চাহিদা এই ছিল যে, মানুষ তার রবের মোকাবিলায় কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবার নীতি অবলম্বন করবে, অনুগ্রহ অস্বীকার করার ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করবে না। আর তার কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক হিসেব–নিকেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং চিন্তা, কথা ও কাজ তিন পর্যায়েই পরিব্যাপ্ত হবে। আমি যা কিছু লাভ করেছি সবই আল্লাহর দান, নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের গভীরে তার এ বিশ্বাস ও চেতনাও সঞ্চারিত হবে। তার কন্ঠে সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতিও উচ্চারিত হবে। কার্যক্ষেত্রেও সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাঁর হুকুম অমান্য করা থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে থেকে, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একথা প্রমাণ করে দেবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত।

১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্জ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি অণু–কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে।

২০. লুকমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমালা থেকে এ বিশেষ উপদেশ বাণীটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে দু'টি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। এক, তিনি নিজ পুত্রকে এ উপদেশটি দেন। আর একথা সুস্পষ্ট, মানুষ যদি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী কারো ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারে তাহলে সে হচ্ছে তার নিজের সন্তান। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাফিকী আচরণ করতে পারে কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকটিও নিজ পুত্রকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কখনই করতে পারে না। তাই লুকমানের তার নিজ পুত্রকে এ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

—আর[২২] প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা–মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে।[২৩] (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা–মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

নসীহত করা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর মতে শিরক যথার্থই একটি নিকৃষ্ট কাজ এবং এ জন্যই তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে এ গোমরাহীটি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। দুই, মক্কার কাফেরদের অনেক পিতা–মাতা সে সময় নিজের সন্তানদেরকে শিরকী ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য বাধ্য করছিল। সামনের দিকের একথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সেই অজ্ঞদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমাদের দেশেরই বহুল পরিচিত জ্ঞানী পণ্ডিত তো তাঁর নিজের পুত্রের মংগল করার দায়িত্বটা তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার নসিহত করার মাধ্যমেই পালন করেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদেরকে শিরক করতে বাধ্য করছো, এটা কি তাদের প্রতি শুভেচ্ছা না তাদের অমংগল কামনা?

২১. জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শিরক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করবে, এটা মানুষের ওপর তার স্রষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা–শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিতও করে এবং এই সংগে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক জুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও জুলুমমুক্ত নয়।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না,[২৪] তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে।[২৫] সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।[২৬]

২২. এখান থেকে প্যারার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ আয়াত দু'টি প্রসংগক্রমে বলা হয়েছে। আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে লুকমানের উক্তির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে একথা বলেছেন।

২৩. এ শব্দগুলো থেকে ইমাম শাফে'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর দুধ পান করার মেয়াদ ২ বছরে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মেয়াদকালে কোন শিশু যদি কোন স্ত্রীলোকের দুধপান করে তাহলে দুধ পান করার "হুরমাত" (অর্থাৎ দুধপান করার কারণে স্ত্রীলোকটি তার মায়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য তার সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়া) প্রমাণিত হয়ে যাবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন প্রকার দুধ পান করার ফলে কোন "হুরমাত" প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ উক্তির স্বপক্ষে ইমাম মালেকেরও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে এ মেয়াদকে বাড়িয়ে আড়াই বছর করার অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সংগে ইমাম সাহেব একথাও বলেন, যদি দু'বছর বা এর চেয়ে কম সময়ে শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে শিশু কেবল দুধের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, তাহলে এরপর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করার ফলে কোন দুধপান জনিত হুরমাত প্রমাণিত হবে না। তবে যদি শিশুর আসল খাদ্য দুধই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য খাদ্য কম বেশী কিছু খেয়ে নিলেও এ সময়ের মধ্যে দুধ পানের কারণে হুরমাত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ শিশুকে অপরিহার্যভাবে দু'বছরেই দুধপান করাতে হবে, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"মায়েরা শিশুদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে, তার জন্য যে দুধপান করার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।" (২৩৩ আয়াত)

يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

(আর লুকমান[২৭] বলেছিল) "হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন।[২৮] তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো।[২৯] একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।[৩০]

ইবনে আব্বাস (রা) এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস। কারণ কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا "তার পেটের মধ্যে অবস্থান করা ও দুধ ছেড়ে দেয়ার কাজ হয় ৩০ মাসে।" (আল আহকাফ, আয়াত ১৫) এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে।

২৪. অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়।

২৫. অর্থাৎ সন্তান ও পিতা-মাতা সবাইকে।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ১১ ও ১২ টীকা।

২৭. লুকমানের অন্যান্য উপদেশমালার উল্লেখ এখানে একথা বলার জন্য করা হচ্ছে যে, আকীদা-বিশ্বাসের মতো নৈতিকতার যে শিক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন তাও আরবে নতুন ও অজানা কথা নয়।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও-এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস তোমার কাছে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু তাঁর কাছে তা রয়েছে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। কাজেই তুমি কোথাও কোন অবস্থায়ও এমন কোন সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারো না যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায়। তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না,[৩১] পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে।[৩২] নিজের চলনে ভারসাম্য আনো[৩৩] এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।[৩৪]

সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন।

২৯. এর মধ্যে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তিই পালন করবে তাকে অনিবার্যভাবে বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হবে। এ ধরনের লোকের পেছনে দুনিয়া কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্টের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে।

৩০. এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটি বড়ই হিম্মতের কাজ। মানবতার সংশোধন এবং তার সংকট উত্তরণে সাহায্য করার কাজ কম হিম্মতের অধিকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব কাজ করার জন্য শক্ত বুকের পাটা দরকার।

৩১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ "সা'আর" বলা হয় আরবী ভাষায় একটি রোগকে। এ রোগটি হয় উটের ঘাড়ে। এ রোগের কারণে উট তার ঘাড় সবসময় একদিকে ফিরিয়ে রাখে। এ থেকেই فلان صعر خده "অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বললো। এ ব্যাপারেই তাগ্‌লাব গোত্রের কবি আমর ইবনে হাই বলেন ঃ

وكنا اذا الجبار صعر خده

اقمنا له من ميله فتقوما

"আমরা এমন ছিলাম যখন কোন দাম্ভিক স্বৈরাচারী আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললো তখন আমরা তার বক্রতার এমন দফারফা করলাম যে একেবারে সোজা হয়ে গেলো"

৩২. মূল শব্দগুলো হচ্ছে مختال ও فخور —'মুখতাল' মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর ফাখূর তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই

অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায়।

৩৩. কোন কোন মুফাস্সির এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, "দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চালে চলো।" কিন্তু পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ধীরে বা দ্রুত চলা আলোচ্য বিষয় নয়। ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কোন কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি? মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদণ্ড থেকেই থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে? আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল–চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, একথাই জানা যায় না, বরং তার চাল–চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন–দওলত, ক্ষমতা–কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল–চলনে একটি বিশেষ ভংগী ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল–চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দুষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল–চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবিলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। লুকমানের উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা–সরল–যুক্তিসংগত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রুচি যে পর্যায়ের গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।" আর একজনকে তিনি দেখলেন সে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন, "ওহে জালেম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন?" এ দু'টি ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত উমরের কাছে দীনদারির অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনি ঘটনা হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো, ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশ্গুল থাকেন) একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "উমর ছিলেন

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

৩ রুকূ'

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন[৩৫] এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ[৩৬] সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন? এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে,[৩৭] তাদের নেই কোন প্রকার জ্ঞান, পথনির্দেশনা বা আলোক প্রদর্শনকারী কিতাব।[৩৮]

কারীদের নেতা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৪৩ টীকা এবং সূরা আল ফুরকান, ৭৯ টীকা।)

৩৪. এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন্ ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন্ ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভংগী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দূরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অব্যশই জোরে বলতে হবে। উচ্চারণভংগীর ফারাকের ব্যাপারটাও এমনি স্থান-কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণভংগী নিন্দা বাক্যের উচ্চারণভংগী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়। হযরত লুকমানের নসীহতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভংগীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা।

৩৫. কোন জিনিসকে কারো জন্য অনুগত করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে : এক, জিনিসটিকে তার অধীন ও ব্যবহারোপযোগী করে দেয়া হবে। তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় ও ব্যবহার করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হবে। দুই, জিনিসটিকে কোন নিয়মের অধীন করে দেয়া হবে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা উপকারী ও লাভজনক হয়ে যাবে এবং এতে তার স্বার্থ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

*আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য করো তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাকে যে রীতির ওপর পেয়েছি তার আনুগত্য করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহবান করতে থাকে তবুও কি তারা তারই আনুগত্য করবে?*৩৯

উদ্ধার হবে। পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসকে মহান আল্লাহ একই অর্থে মানুষের জন্য অনুগত করে দেননি। বরং কোন জিনিসকে প্রথম অর্থে এবং কোনটিকে দ্বিতীয় অর্থে অনুগত করে দিয়েছেন। যেমন পানি, মাটি, আগুন, উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ, গবাদি পশু ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রথম অর্থে এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র ইত্যাদিকে দ্বিতীয় অর্থে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।

৩৬. যেসব নিয়ামত কোন না কোনভাবে মানুষ অনুভব করে এবং তার জ্ঞানে ধরা দেয় সেগুলো প্রকাশ্য নিয়ামত। আর যেসব নিয়ামত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নিয়ামত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ–সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই তার সামনে আল্লাহর এমনসব নিয়ামতের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে তার সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল। আবার আজ পর্যন্ত যেসব নিয়ামতের জ্ঞান মানুষ লাভ করতে পেরেছে সেগুলো এমনসব নিয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ যেগুলোর ওপর থেকে এখনো গোপনীয়তার পর্দা ওঠেনি।

৩৭. অর্থাৎ ঝগড়া ও বিতর্ক রে এমন ধরনের বিষয়াদি নিয়ে যেমন, আল্লাহ আছে কিনা? আল্লাহ কি একা, না আরো আল্লাহ আছেন? তাঁর গুণাবলী কি এবং তিনি কেমন? নিজের সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ের? ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩৮. অর্থাৎ তাদের কাছে জ্ঞানের এমন কোন মাধ্যম নেই যার সাহায্যে তারা সরাসরি সত্যকে দেখতে বা পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সন্ধান পেতে পারে অথবা এমন কোন পথপ্রদর্শকের পথনির্দেশনাও তাদের কাছে নেই যিনি নিজে সত্যকে দেখে তাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। কিংবা আল্লাহর এমন কোন কিতাব তাদের কাছে নেই যার ওপর তারা এ বিশ্বাসের ভিত্তি রাখতে পারে।

৩৯. অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির, পরিবারের ও ব্যক্তির বাপ–দাদারা অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন কোন কথা নেই। পদ্ধতিটির বাপ–দাদার আমল থেকে চলে আসাই তার সত্য হবার প্রমাণ নয়। বাপ–দাদা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলেও চোখ বন্ধ করে

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۲۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۳﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۲۴﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে[৪০] এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল,[৪১] সে তো বাস্তবিকই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।[৪২] আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে। এরপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে বিষণ্ন না করে।[৪৩] তাদেরকে ফিরে তো আসতে হবে আমারই দিকে। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো তারা কিসব কাজ করে এসেছে। অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন। আমি স্বল্পকাল তাদেরকে দুনিয়ায় ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি, তারপর তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবো একটি কঠিন শাস্তির দিকে।

তাদেরই পথে পাড়ি জমানো হবে এবং কখনো এ পথটি কোন্ দিকে গিয়েছে এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনুসন্ধান করার প্রয়োজনই অনুভব করা হবে না, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এমন অজ্ঞতার কাজ করতে পারে না।

৪০. অর্থাৎ নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করে। নিজের কোন জিনিসকে আল্লাহর বন্দেগীর বাইরে রাখে না। নিজের সমস্ত বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর প্রদত্ত পথনির্দেশকে নিজের সারা জীবনের আইনে পরিণত করে।

৪১. অর্থাৎ মুখে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ঘোষণা দেয়া হবে কিন্তু কার্যত আল্লাহর অনুগত বান্দার নীতি অবলম্বন করা হবে না, এমনটি যেন না হয়।

৪২. অর্থাৎ সে এ ভয়ও করবে না যে, সে ভুল পথনির্দেশ পাবে এবং আল্লাহর বন্দেগী করলে তার পরিণাম ধ্বংস হবে, এ আশংকাও করবে না।

৪৩. সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থ হচ্ছে, হে নবী! যে ব্যক্তি তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে তো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মনে করে যে, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরীকে মেনে নিয়েও তার ওপর জোর দিয়ে সে তোমাকে অপমানিত করেছে কিন্তু আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। সে তোমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। কাজেই সে যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।[৪৪] কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে না।[৪৫] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই।[৪৬] নিসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও নিজে নিজেই প্রশংসিত।[৪৭] পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়), তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না।[৪৮] অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। তোমাদের সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা এবং তারপর পুনর্বার তাদেরকে জীবিত করা (তাঁর জন্য) নিছক একটিমাত্র প্রাণী (সৃষ্টি করা এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত) করার মতই ব্যাপার। আসলে আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৪৯]

৪৪. অর্থাৎ তোমরা যে এতটুকু কথা জানো ও স্বীকার করো এ জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু এটাই যখন প্রকৃত সত্য তখন প্রশংসা সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিতে যখন অন্য কোন সত্তার কোন অংশ নেই তখন সে প্রশংসার হকদার হতে পারে কেমন করে?

৪৫. অর্থাৎ অধিকাংশ লোক জানে না যে, যদি আল্লাহকে বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা বলে না মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অনিবার্য ফল ও দাবী কি হয় এবং কোন্ কথাগুলো এর বিরুদ্ধে চলে যায়। যখন এক ব্যক্তি একথা মেনে নেয় যে, একমাত্র আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা তখন অনিবার্যভাবে তাকে একথাও মেনে নিতে হবে যে, ইলাহ ও রবও একমাত্র আল্লাহই। ইবাদাত ও আনুগত্যের হকদারও একমাত্র তিনিই। একমাত্র তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করতে এবং তাঁরই প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে না। নিজের সৃষ্টির জন্য আইন প্রণেতা ও শাসক তিনি

ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। একজন হবেন স্রষ্টা অন্যজন হবেন মাবুদ, এটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিরোধী ও বিপরীতমুখী কথা। মূর্খতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে একমাত্র এমন ব্যক্তিই একথা বলতে পারে। তেমনিভাবে একজনকে স্রষ্টা বলে মেনে নেয়া এবং তারপর অন্য বিভিন্ন সত্তার মধ্য থেকে একজনকে প্রয়োজন পূর্ণকারী ও সংকট নিরসনকারী, অন্যজনের সামনে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত হওয়া এবং তৃতীয় একজনকে ক্ষমতাসীন শাসকের স্বীকৃতি দেয়া ও তার আনুগত্য করা—এসব পরস্পর বিরোধী কথা। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এসব কথা মেনে নিতে পারে না।

৪৬. অর্থাৎ কেবল এতটুকুই সত্য নয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ বরং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তিনিই এসবের মালিক। আল্লাহ তাঁর এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে একে এমনিই ছেড়ে দেননি যে, যে কেউ চাইলেই এর বা এর কোন অংশের মালিক হয়ে বসবে। নিজের সৃষ্টির তিনি নিজেই মালিক। এ বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এখানে তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবার ইখতিয়ার নেই।

৪৭. এর ব্যাখ্যা এসে গেছে ১৯ টীকায়।

৪৮. 'আল্লাহর কথা' মানে তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন। এ বিষয়বস্তুটি সূরা আল কাহ্ফের ১০৯ আয়াতে এর থেকে আরো একটু ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টে এক ব্যক্তি ধারণা করবে, বোধ হয় এ বক্তব্যে বাড়াবাড়ি বা অতিকথন আছে। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে এক ব্যক্তি অনুভব করবে, এর মধ্যে তিল পরিমাণও অতিকথা নেই। এ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে যতগুলো কলম তৈরি করা যেতে পারে এবং পৃথিবীর বর্তমান সাগরের পানির সাথে আরো তেমনি সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলে তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি, জ্ঞান ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা তো দূরের কথা হয়তো পৃথিবীতে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করাই সম্ভবপর হবে না। শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই যেসব জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোই গণনা করা কঠিন, তার ওপর আবার এই অথৈ মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিবরণ লেখার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ বর্ণনা থেকে আসলে এ ধরনের একটি ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এত বড় বিশ্ব-জাহানকে যে আল্লাহ অস্তিত্ব দান করেছেন এবং আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এর যাবতীয় আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে চলেছেন তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তোমরা যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করে বসেছো তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদাই বা কি! এই বিরাট-বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং নিছক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত লাভ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাহলে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে কেউ এখানে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতার কোন অংশও লাভ করতে পারে, যার ভিত্তিতে সে ভাগ্য ভাঙা গড়ার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে?

৪৯. অর্থাৎ তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আওয়াজ আলাদা আলাদাভাবে শুনছেন এবং কোন আওয়াজ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এমনভাবে দখল করে বসে না যার ফলে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে? তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে রেখেছেন,[৫০] সবই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[৫১] আর (তুমি কি জানো না) তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তা জানেন। এ সবকিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য[৫২] এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা,[৫৩] আর (এ কারণে যে,) আল্লাহই সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।[৫৪]

একটি শুনতে গিয়ে অন্যগুলো শুনতে না পারেন। অনুরূপভাবে তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে তার প্রত্যেকটি জিনিস ও ঘটনা সহকারে বিস্তারিত আকারেও দেখছেন এবং কোন জিনিস দেখার ব্যাপারে তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, একটিকে দেখতে গিয়ে তিনি অন্যগুলো দেখতে অপারগ হয়ে পড়েন। মানবকুলের সৃষ্টি এবং তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটিও ঠিক এই একই পর্যায়ের। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ জন্ম নিয়েছে এবং আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে তাদের সবাইকে তিনি আবার মাত্র এক মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা একটি মানুষের সৃষ্টিতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে না যে, সে একই সময়ে তিনি অন্য মানুষদের সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে পড়েন। একজন মানুষ সৃষ্টি করা বা কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করা দু'টোই তাঁর জন্য সমান।

৫০. অর্থাৎ রাত ও দিনের যথারীতি নিয়মিত আসাই একথা প্রকাশ করে যে, সূর্য ও চন্দ্র একটি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ এখানে নিছক এ জন্য করা হয়েছে যে, এ দু'টি মহাশূন্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান জিনিস এবং মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেরকে উপাস্যে পরিণত করে আসছে এবং আজো বহুলোক এদেরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ পৃথিবীসহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে একটি অনড় নিয়ম-শৃংখলা ও আইনের নিগড়ে বেঁধে রেখেছেন। এ থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করার ক্ষমতা তাদের নেই।

৫১. প্রত্যেকটি জিনিসের যে বয়স তথা সময়-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। চন্দ্র, সূর্য বা বিশ্ব-জাহানের অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্র কোনটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকের একটি সূচনাকাল আছে। তার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

তুমি কি দেখো না সমুদ্রে নৌযান চলে আল্লাহর অনুগ্রহে, যাতে তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর কিছু নিদর্শন।[৫৫] আসলে এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন প্রত্যেক সবর ও শোকরকারীর জন্য।[৫৬] আর যখন (সমুদ্রে) একটি তরংগ তাদেরকে ছেয়ে ফেলে ছাউনির মতো তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে একদম তাঁরই জন্য একান্ত করে নিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়,[৫৭] আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।[৫৮]

না। আবার-প্রত্যেকের আছে একটি সমাপ্তিকাল। তারপর আর তার অস্তিত্ব থাকবে না। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের ধ্বংসশীল ও ক্ষমতাহীন বস্তু ও সত্তাগুলো উপাস্য হতে পারে কেমন করে?

৫২. অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক।

৫৩. অর্থাৎ তারা সবাই নিছক তোমাদের কাল্পনিক খোদা। তোমরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছো যে, অমুকজন আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।

৫৪. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের উর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে সব জিনিসই নিচু। প্রত্যেকের চেয়ে তিনি বড় এবং সবাই তাঁর সামনে ছোট।

৫৫. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী দেখাতে চান যা থেকে জানা যায় একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। মানুষ যতই বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন ও সমুদ্র যাত্রার উপযোগী জাহাজ নির্মাণ করুক এবং জাহাজ পরিচালনা বিদ্যা ও তার সাথে সম্পর্কিত তথ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় যতই পারদর্শী হোক না কেন সমুদ্রে তাকে যেসব ভয়ংকর শক্তির সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সেগুলোর মোকাবিলায় সে একা নিজের দক্ষতা

ও কৌশলের ভিত্তিতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সফর করতে পারে না। তাঁর অনুগ্রহদৃষ্টি সরে যাবার সাথে সাথেই মানুষ জানতে পারে তার উপায়-উপকরণ ও কারিগরী পারদর্শিতা কতটা অর্থহীন ও অকেজো। অনুরূপভাবে নিরাপদ ও নিশ্চিত অবস্থায় মানুষ যতই কট্টর নাস্তিক ও মুশরিক হোক না কেন সমুদ্রে তূফানে যখন তার নৌযান ডুবে যেতে থাকে তখন নাস্তিকও জানতে পারে আল্লাহ আছেন এবং মুশরিকও জেনে ফেলে আল্লাহ মাত্র একজনই।

৫৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যায় তারা যখন এ নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে সত্যকে চিনতে পারে তখন তারা চিরকালের জন্য তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে। প্রথম গুণটি হচ্ছে, তাদের বড়ই সবরকারী (صبار) তথা অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। তারা অস্থিরমতি হবে না বরং তাদের পদক্ষেপে দৃঢ়তা থাকবে। সহনীয় ও অসহনীয়, কঠিন ও কোমল এবং ভালো ও মন্দ সকল অবস্থায় তারা একটি সৎ ও সুস্থ বিশ্বাসের ওপর অটল থাকবে। তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন দুর্বলতা থাকবে না যে, দুঃসময়ের মুখোমুখি হলে আল্লাহর সামনে নতজানু হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকবে আর সুসময় আসার সাথে সাথেই সবকিছু ভুলে যাবে। অথবা এর বিপরীত ভালো অবস্থায় আল্লাহকে মেনে চলতে থাকবে এবং বিপদের একটি আঘাতেই আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে তাদেরকে বড়ই শোকরকারী (شكور) তথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হতে হবে। তারা নিমকহারাম ও বিশ্বাসঘাতক হবে না, উপকারীর উপকার ভুলে যাবে না। বরং অনুগ্রহের কদর করবে এবং অনুগ্রহকারীর জন্য একটি স্বতন্ত্র কৃতজ্ঞতার অনুভূতি হর-হামেশা নিজের মনের মধ্যে জাগ্রত রাখবে।

৫৭. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। মাঝপথকে যদি সরল ও সঠিক পথের অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই হয় যারা তূফানে ঘেরাও হবার পর যে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল সে সময় অতিক্রান্ত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকে এবং এ শিক্ষাটি তাদেরকে চিরকালের জন্য সত্য ও সঠিক পথযাত্রীতে পরিণত করে। আর যদি মাঝপথের অর্থ করা হয় মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য, তাহলে এর একটি অর্থ হবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ অভিজ্ঞতা লাভের আগের সময়ের মতো নিজেদের শিরক ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-বিশ্বাসে আর তেমন একনিষ্ঠ ও শক্তভাবে টিকে থাকে না। এর দ্বিতীয় অর্থ হবে, সে সময় অতিক্রান্ত হবার পর তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের মধ্যে আন্তরিকতার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ এখানে এ দ্ব্যর্থক বাক্যাংশটি এ তিনটি অবস্থার প্রতি ইংগিত করার জন্যই ব্যবহার করেছেন, এটারই সম্ভাবনা বেশী। তবে উদ্দেশ্য সম্ভবত একথা বলা যে, সামুদ্রিক ঝড়ের সময় সবার টনক নড়ে যায় এবং বুদ্ধি ঠিকমত কাজ করে। তখন তারা শিরক ও নাস্তিক্যবাদ পরিহার করে সবাই এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে সাহায্যের জন্য। কিন্তু নিরাপদে উপকূলে পৌঁছে যাবার পর স্বল্পসংখ্যক লোকই এ অভিজ্ঞতা থেকে কোন স্থায়ী শিক্ষা লাভ করে। আবার এ স্বল্প সংখ্যক লোকেরাও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল, যারা চিরকালের জন্য শুধরে যায়। দ্বিতীয় দলের কুফরীর মধ্যে কিছুটা সমতা আসে। তৃতীয় দলটি এমন পর্যায়ের যাদের মধ্যে উক্ত সাময়িক ও জরুরী সময়কালীন আন্তরিকতার কিছু না কিছু বাকি থাকে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

হে মানুষেরা! তোমাদের রবের ক্রোধ থেকে সতর্ক হও এবং সেদিনের ভয় করো যেদিন কোন পিতা নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবে না এবং কোন পুত্রই নিজের পিতার পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান দেবে না।[৫৯] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।[৬০] কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে[৬১] এবং প্রতারক যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়।[৬২]

৫৮. এর আগের আয়াতে যে দু'টি গুণের বর্ণনা এসেছে তার মোকাবিলায় এখানে এ দু'টি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক এমন এক ব্যক্তি যে মারাত্মক রকমের বেঈমানী করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পালন করে না। আর অকৃতজ্ঞ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার প্রতি যতই অনুগ্রহ করা হোক না কেন সে তা কখনোই স্বীকার করে না এবং নিজের অনুগ্রহকারীর প্রতি আগ্রাসী আচরণ করে। এসব দোষ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারা বিপদ উত্তীর্ণ হবার পর নিসংকোচে নিজেদের কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের দিকে ফিরে যায়। ঝড়–তুফানের সময় তারা আল্লাহর অস্তিত্বের এবং একক আল্লাহর অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন বাইরে ও নিজেদের মনের মধ্যেও পেয়েছিল এবং এ সত্যের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিই তাদেরকে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা তারা মানতে চায় না। তাদের মধ্যে যারা নাস্তিক তারা তাদের এ কাজের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, এ তো ছিল একটা দুর্বলতা। কঠিন বিপদের সময় অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এ দুর্বলতার শিকার হয়েছিলাম। নয়তো আসলে আল্লাহ বলতে কিছুই নেই। ঝড়–তুফানের মুখ থেকে কোন আল্লাহ আমাদের বাঁচায়নি। অমুক অমুক কারণে ও উপায়ে আমরা বেঁচে গেছি। আর মুশরিকরা তো সাধারণভাবেই বলে থাকে, অমুক অমুক সাধুবাবা অথবা দেবী ও দেবতার ছায়া আমাদের মাথার ওপর ছিল। তাঁদের কল্যাণেই আমরা এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছি। কাজেই তীরে পৌঁছেই তারা নিজেদের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং তাদের দরজায় গিয়ে শিন্নী চড়াতে থাকে। তাদের মনে এ চিন্তার উদয়ই হয় না যে, যখন সবদিকের সব আশা–ভরসা–সহায় ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তখন একমাত্র এক লা–শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিল না এবং তাঁরই শরণাপন্ন তারা হয়েছিল।

৫৯. অর্থাৎ বন্ধু, নেতা, পীর এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা তবুতো দূর সম্পর্কের। দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে। কিন্তু সেখানে অবস্থা হবে যদি পুত্র পাকড়াও হয়, তাহলে পিতা এগিয়ে গিয়ে একথা বলবে না যে, তার গোনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করো। অন্যদিকে পিতার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেলে পুত্রের

একথা বলার হিম্মত হবে না যে, তাঁর বদলে আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। এ অবস্থায় নিকট সম্পর্কহীন ভিন ব্যক্তিরা সেখানে পরস্পরের কোন কাজে লাগবে এ আশা করার কি অবকাশই বা থাকে ! কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পরের জন্য নিজের পরকাল ঝরঝরে করে অথবা অন্যের ওপর ভরসা করে নিজে ভ্রষ্টতা ও পাপের পথ অবলম্বন করে সে একটা গণ্ডমূর্খ। এ প্রসংগে ১৫ আয়াতের বিষয়বস্তুও সামনে রাখা উচিত। সেখানে সন্তানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, দুনিয়াবী জীবনের বিভিন্ন কাজে–কারবারে অবশ্যই পিতা–মাতার সেবা করতে ও তাদের কথা মেনে চলতে হবে কিন্তু ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিতা–মাতার কথায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন কোনমতেই ঠিক নয়।

৬০. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবেই। সেখানে প্রত্যেককে তার নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬১. দুনিয়ার জীবন স্থূলদর্শী লোকদেরকে নানা রকমের ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করে। কেউ মনে করে, বাঁচা–মরা যা কিছু শুধুমাত্র এ দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এরপর আর দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। কাজেই যা কিছু করার এখানেই করে নাও। কেউ অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে যায় এবং এ ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, তার এ আরাম–আয়েশ ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী, এর ক্ষয় নেই। কেউ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র বৈষয়িক লাভ ও স্বাদ–আহলাদকে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে নেয় এবং "জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন" ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যকে কোন গুরুত্বই দেয় না। এর ফলে তার মনুষ্যত্বের মান যত নিচে নেমে যেতে থাক না কেন তার কোন পরোয়াই সে করে না। কেউ মনে করে বৈষয়িক সমৃদ্ধিই ন্যায়–অন্যায় ও সত্য–মিথ্যার আসল মানদণ্ড। এ সমৃদ্ধি যে পথেই অর্জিত হবে তাই সত্য এবং তার বিপরীত সবকিছুই মিথ্যা। কেউ এ সমৃদ্ধিকেই আল্লাহর দরবারে অনুগৃহীত হবার আলামত মনে করে। এর ফলে সে সাধারণভাবে মনে করতে থাকে, যদি দেখা যায় যে কোন উপায়েই হোক না কেন একজন লোক বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে চলেছে, তাহলে সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং যার বৈষয়িক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তা হক পথে থাকা ও সৎনীতি অবলম্বন করার কারণেই হোক না কেন তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। এ ধারণা এবং এ ধরনের যত প্রকার ভুল ধারণা আছে সবগুলোকেই মহান আল্লাহ এ আয়াতে "দুনিয়ার জীবনের প্রতারণা" বলে উল্লেখ করেছেন।

৬২. الغرور (প্রতারক) শয়তানও হতে পারে আবার কোন মানুষ বা একদল মানুষও হতে পারে, মানুষের নিজের মন ও প্রবৃত্তিও হতে পারে এবং অন্য কোন জিনিসও হতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তু নির্ধারণ না করে এ বহুমুখী অর্থের অধিকারী শব্দটিকে তার সাধারণ ও সার্বজনীন অর্থে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন লোকের কাছে প্রতারিত হবার মূল কারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি বিশেষ করে যে উপায়েই এমন প্রতারণার শিকার হয়েছে যা সঠিক দিক থেকে ভুল দিকে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তা–ই তার জন্য "আল গারূর" তথা প্রতারক।

"আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করা" শব্দগুলোও অনেক ব্যাপক অর্থের অধিকারী। বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা এর অন্তরভুক্ত হয়। কাউকে তার "প্রতারক" এ নিশ্চয়তা দেয় যে,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٣٤

*একমাত্র আল্লাহই সেই সময়ের জ্ঞান রাখেন। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোন প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন্ যমীনে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।*৬৩

আল্লাহ আদতেই নেই। কাউকে বুঝায়, আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করে হাত–পা গুটিয়ে বসে গেছেন এবং এখন এ দুনিয়া তিনি বান্দাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাউকে এ ভুল ধারণা দেয় যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়পাত্র আছে, যাদের নৈকট্য অর্জন করে নিলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তুমি নিশ্চিতভাবেই ক্ষমার অধিকারী হবে। কাউকে এভাবে প্রতারণা করে যে, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা পাপ করতে থাকো, তিনি ক্ষমা করে যেতে থাকবেন। কাউকে বুঝায়, মানুষ তো নিছক একটা অক্ষম জীব ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দেয় এই বলে যে, তোমাদের তো হাত–পা বাঁধা, যা কিছু খারাপ কাজ তোমরা করো সব আল্লাহই করান। ভালো কাজ থেকে তোমরা দূরে সরে যাও, কারণ আল্লাহ তা করার তাওফীক তোমাদের দেন না। নাজানি আল্লাহর ব্যাপারে এমনিতর কত বিচিত্র প্রতারণার শিকার মানুষ প্রতিদিন হচ্ছে। যদি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি গোমরাহী, গোনাহ ও অপরাধের মূল কারণ হিসেবে দেখা যাবে, মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে কোন না কোন প্রতারণার শিকার হয়েছে এবং তার ফলেই তার বিশ্বাসে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তি অথবা সে নৈতিক চরিত্রহীনতার শিকার হয়েছে।

৬৩. এটি আসলে একটি প্রশ্নের জবাব। কিয়ামতের কথা ও আখেরাতের প্রতিশ্রুতি শুনে মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্নটি করতো। প্রশ্নটি ছিল, সে সময়টি কবে আসবে? কুরআন মজীদে কোথাও তাদের এ প্রশ্নটি উদ্ধৃত করে জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও উদ্ধৃত না করেই জবাব দেয়া হয়েছে। কারণ শ্রোতাদের মনে এ প্রশ্ন জাগরুক ছিল। এ আয়াতটিতেও প্রশ্নের উল্লেখ ছাড়াই জবাব দেয়া হয়েছে।

"একমাত্র আল্লাহই সে সময়ের জ্ঞান রাখেন" এ প্রথম বাক্যটিই মূল প্রশ্নের জবাব। তার পরের চারটি বাক্য এ জবাবের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ নিকটতম আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলো সম্পর্কেও তার কোন জ্ঞান নেই। তাহলে সারা দুনিয়ার শেষ ক্ষণটি কবে ও কখন আসবে, একথা জানা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব? তোমাদের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা

বিরাটভাবে নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। কিন্তু আল্লাহর হাতে রয়েছে এর পুরো যোগসূত্র। যেখানে যখন যতটুকু চান বর্ষণ করান এবং যখনি চান থামিয়ে দেন। কেউ একটুও জানে না কোথায় কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে এবং কোন্ ভূখণ্ড তা থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোন্ ভূখণ্ডে বৃষ্টি উল্টো ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। তোমাদের বীর্যে তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার হয় এবং এর সাথে তোমাদের বংশধারার ভবিষ্যত জড়িত। কিন্তু তোমরা জানো না এ গর্ভে কি লালিত হচ্ছে এবং কোন্ আকৃতিতে ও কোন্ ধরনের কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে তা বের হয়ে আসবে। আগামীকাল তোমাদের কি হবে তা–ও তোমরা জানো না।

একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা তোমাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক মিনিট আগেও তোমরা তার খবর পাও না। তোমরা এও জানো না, তোমাদের এ জীবনের সমাপ্তি ঘটবে কোথায় কি অবস্থায়। এ সমস্ত তথ্যজ্ঞান আল্লাহ নিজেরই কাছে রেখেছেন এবং এর কোন একটির জ্ঞানও তোমাদের দেননি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই এমন যে সম্পর্কে তোমরা পূর্বাহ্নেই কিছু জানতে চাও যাতে এ জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা আগেভাগেই কিছু পদক্ষেপ নিতে পারো। কিন্তু সেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর ফায়সালার ওপর ভরসা করো। এভাবে দুনিয়ার শেষক্ষণটির ব্যাপারেও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা স্থাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এর জ্ঞানও কাউকে দেয়া হয়নি এবং দেয়া যেতে পারে না।

এখানে আর একটি কথাও ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সেটি হচ্ছে, যেসব বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তেমনি ধরনের গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াবলীর কোন তালিকা এখানে দেয়া হয়নি। এখানে তো কেবলমাত্র হাতের কাছের কিছু জিনিস উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। যেগুলোর প্রতি মানুষের গভীরতম ও নিকটতম আকর্ষণ ও আগ্রহ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না যে, মাত্র এ পাঁচটি বিষয়ই গায়েবের অন্তরভুক্ত, যে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না। অথচ গায়েব এমন জিনিসকে বলা হয় যা সৃষ্টির অগোচরে এবং একমাত্র আল্লাহর দৃষ্টি সমক্ষে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ গায়েবের কোন সীমা পরিসীমা নেই। (এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহ্‌ল, ৮৩ টীকা)

আস্‌ সাজদাহ

৩২

নামকরণ

১৫ আয়াতে সাজদাহর যে বিষয়বস্তু এসেছে তাকেই এ সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায়, এর নাযিল হবার সময়টা হচ্ছে মক্কার মধ্যযুগ এবং তারও একেবারে শুরুর দিকে। কারণ পরবর্তী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পশ্চাতভূমিতে যেমন জুলুম–নিপীড়নের প্রচণ্ডতা দেখা যায় এ সূরাটির পটভূমিতে সে ধরনের প্রচণ্ডতা অনুপস্থিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ দূর করা এবং এ তিনটি সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো। মক্কার কাফেরদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যে, এ ব্যক্তি অদ্ভূত সব কথা বানিয়ে বানিয়ে শুনাচ্ছে। কখনো মরার পরের খবরও দেয় এবং বলে মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবার পর তোমাদের আবার উঠানো হবে। সবার হিসেব–নিকেশ হবে এবং দোজখ হবে ও বেহেশ্‌ত হবে। কখনো বলে, এসব দেব–দেবী, ঠাকুর–টাকুর এসব কিছুই নয়। একমাত্র এক ও একক আল্লাহই উপাস্য। কখনো বলে, আমি আল্লাহর রসূল। আকাশ থেকে আমার কাছে অহী আসে। যে বাণী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি এসব আমার বাণী নয় বরং আল্লাহর বাণী। এ ব্যক্তি আমাদের এ অদ্ভূত কাহিনী শুনাচ্ছে। এসব কথার জবাব দেয়াই হচ্ছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

এর জবাবে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিসন্দেহে এগুলো আল্লাহর কালাম ও বাণী। নবুওয়াতের কল্যাণ বঞ্চিত গাফলতির নিদ্রায় বিভোর একটি জাতিকে জাগিয়ে দেবার জন্য এ কালাম নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর অবতীর্ণ হবার বিষয়টি যখনি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তখন তোমরা একে মিথ্যা বলতে পারো কেমন করে?

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, এ কুরআন তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করে, বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করে নিজেরাই চিন্তা করে বলো এর মধ্যে কোন্‌টা তোমাদের মতে অদ্ভূত? আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা দেখো, নিজেদের জন্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা

করো—এ সবকিছু কি এ কুরআনে এ নবীর মাধ্যমে তোমাদের যেসব শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সত্যতার প্রমাণ নয়? বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করে, না শিরকের? এ সমগ্র ব্যবস্থা দেখে এবং তোমাদের নিজেদের জন্মের ব্যাপারটি দৃষ্টি সমক্ষে রেখে তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কি একথাই বলে যে, যিনি বর্তমানে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনর্বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না?

এরপর পরলোকের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঈমানের পুরস্কার ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করে লোকদেরকে অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবার আগে ত্যাগ ও কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, এভাবে তাদের নিজেদের পরিণাম শুভ ও সুন্দর হবে।

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের ভুলের দরুন তাকে আকস্মিকভাবে চূড়ান্ত ও শেষ শাস্তি দেবার জন্য পাকড়াও করেন না, এটা তাঁর মহা অনুগ্রহ। বরং এর পূর্বে তাকে ছোটখাটো কষ্ট, বিপদ-আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন করেন। তাকে হাল্‌কা হাল্‌কা ও কম কষ্টকর আঘাত করতে থাকেন। এভাবে তাকে সতর্ক করতে থাকেন, যাতে তার চোখ খুলে যায়। মানুষ যদি এসব প্রাথমিক আঘাতে সতর্ক হয়ে যায় তাহলে তা হবে তার নিজের জন্য ভালো।

এরপর বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির কাছে কিতাব এসেছে, দুনিয়ায় এটা কোন প্রথম ও নতুন ঘটনা নয়। এর আগে মূসার (আলাইহিস সালামের) কাছেও তো কিতাব এসেছিল। একথা তোমরা সবাই জানো। এটা এমন কী কথা যে, তা শুনেই তোমরা এভাবে কানখাড়া করছো। বিশ্বাস করো এ কিতাব আল্লাহরই পক্ষ থেকে এসেছে এবং মূসার (আ) যুগে যা কিছু হয়েছিল এখন আবার সেসব কিছুই হবে, একথা নিশ্চিত জেনো। আল্লাহর এ কিতাবকে যারা মেনে নেবে এখন নেতৃত্ব তারাই লাভ করবে। একে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য নিশ্চিত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তারপর মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিজেদের বাণিজ্যিক সফরকালে তোমরা অতীতের যেসব জাতির ধ্বংসে প্রাপ্ত জনপদ অতিক্রম করে থাকো তাদের পরিণাম দেখো। নিজেদের জন্য তোমরা কি এ পরিণাম পছন্দ করো? বাইরের অবস্থা দেখে প্রতারিত হয়ো না। আজ তোমরা দেখছো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কতিপয় ছেলে-ছোকরা, গোলাম ও গরীব মানুষ ছাড়া আর কেউ শুনছে না এবং চারদিক তাঁর বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রূপ, তিরস্কার ও নিন্দাবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এ থেকে তোমরা ধারণা করে নিয়েছো, এ বক্তব্য-বিষয় টেকসই হবে না, কিছু দিন চলবে তারপর খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কেবল তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। তোমরা দিনরাত দেখছো আজ একটি জমি নিষ্ফল পড়ে আছে, সেখানে পানি ও লতাপাতার চিহ্নমাত্রও নেই। জমিটি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এর গর্ভে সবুজ ও শ্যামলিমার বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পরদিন বৃষ্টিপাত হতেই ঐ মরা মাটির বুকে দেখা দেয় অভাবিত পূর্ব জীবন প্রবাহ এবং সর্বত্র সবুজের বিচিত্র সমারোহ।

উপসংহারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এরা তোমার কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং জিজ্ঞেস করছে, জনাব! আপনার সেই চূড়ান্ত

বিজয় কবে অর্জিত হবে? তার সন–তারিখটা একটু বলেন না। ওদেরকে বলো, যখন আমাদের ও তোমাদের ফায়সালার সময় আসবে তখন তা মেনে নেয়ায় তোমাদের কোন উপকার হবে না। মানতে হয় এখন মানো। আর যদি শেষ ফায়সালার অপেক্ষা করতে চাও তাহলে বসে বসে তা করতে থাকো।

الٓمّٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣

আলিফ লাম মীম। এ কিতাবটি রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।[১]

এরা[২] কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি তৈরি করে নিয়েছেন?[৩] না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে,[৪] যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে।[৫]

১. কুরআন মজীদের অনেকগুলো সূরা এ ধরনের কোন না কোন পরিচিতিমূলক বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এ বাণী কোথায় থেকে আসছে সূরার শুরুতেই তা জানিয়ে দেয়াই হয় এর উদ্দেশ্য। রেডিও ঘোষক প্রোগ্রাম শুরু করার সূচনাতেই যেমন ঘোষণা করে দেন, আমি অমুক স্টেশন থেকে বলছি, এটা বাহ্যত তেমনি ধরনের একটা ভূমিকাসূচক বক্তব্য। কিন্তু রেডিওর এমনি ধরনের একটা মামুলি ঘোষণার বিপরীতে কুরআন মজীদের কোন সূরার সূচনা যখন এ ধরনের একটা অসাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়, যাতে বলা হয়, এ বাণী আসছে বিশ্ব–জাহানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে তখন এটা শুধুমাত্র বাণীর উৎস বর্ণনা করাই হয় না বরং এই সংগে এর মধ্যে শামিল হয়ে যায় একটা বিরাট বড় দাবী, একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং একটা কঠোর ভীতি প্রদর্শনও। কারণ কথা শুরু করেই সে ঝট্ করে এত বড় একটা খবর দিয়ে দিচ্ছে যে, এটা মানুষের কথা নয় বরং বিশ্ব–জাহানের মালিক ও প্রভুর কথা। সংগে সংগেই এ ঘোষণা মানুষের সামনে এ দাবী স্বীকার করা না করার প্রশ্ন উত্থাপন করে। স্বীকার করলে চিরকালের জন্য তার সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তারপর তার মোকাবিলায় মানুষের আর কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আর স্বীকার না করলে নিশ্চিতভাবেই তাকে একটা ভয়াবহ আশংকার মুখোমুখি হতে হবে। অর্থাৎ যদি সত্যিই

এটা বিশ্ব–জাহানের প্রভুর বাণী হয়ে থাকে তাহলে একে প্রত্যাখ্যান করার ফল স্বরূপ তাকে চিরন্তন দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে। এ জন্য এ ভূমিকাসূচক বাক্যটির শুধুমাত্র নিজের এই প্রকৃতিগত অসাধারণত্বেরই কারণে মানুষকে কান লাগিয়ে চূড়ান্ত মনোনিবেশ সহকারে এ বাণী শোনার এবং একে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করার বা না করার ফায়সালা করতে বাধ্য করে।

এ কিতাব রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই এখানে শেষ করা হয়নি। বরং এর পরেও পূর্ণ জোরেশোরে বলা হয়েছে لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ এটা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর কাছ থেকে এর অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। এ তাকিদসূচক বাক্যাংশটিকে যদি কুরআন নাযিলের ঘটনামূলক পটভূমি এবং খোদ কুরআনের নিজের পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে দেখা হয় তাহলে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, তার মধ্যে দাবীর সাথে যুক্তি–প্রমাণও নিহিত রয়েছে এবং এ যুক্তি–প্রমাণ মক্কা মু'আয্যমার যেসব অধিবাসীর সামনে এ দাবী পেশ করা হচ্ছিল তাদের কাছে গোপন ছিল না। এ কিতাব উপস্থাপন কারীর সমগ্র জীবন তাদের সামনে ছিল। কিতাব উপস্থাপন করার আগেরও এবং পরেরও। তারা জানতো, যিনি এ দাবী সহকারে এ কিতাব পেশ করছেন তিনি আমাদের জাতির সবচেয়ে সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। তারা এও জানতো যে, নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে কখনো সেসব কথা শোনেনি যেগুলো নবুওয়াত দাবী করার পরপরই তিনি সহসাই বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা এ কিতাবের ভাষা ও বর্ণনাভংগী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা ও বর্ণনাভংগীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পেতো। তারা পরিষ্কারভাবে একথাও জানতো যে, একই ব্যক্তি কখনো এত বেশী সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে দু'টি ভিন্ন স্টাইলের অধিকারী হতে পারে না। তারা এ কিতাবের একান্ত অসাধারণ সাহিত্য অলংকারও দেখছিল এবং আরবী ভাষাভাষী হিসেবে তারা নিজেরাই জানতো যে, তাদের সকল কবি ও সাহিত্যিক এর নজির পেশ করতে অক্ষম হয়েছে। তাদের জাতির কবি, গণক ও বাগ্মীদের বাণী এবং এ বাণীর মধ্যে কত বড় ফারাক রয়েছে এবং এ বাণীর মধ্যে যে পবিত্র–পরিচ্ছন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা কত উন্নতমানের তাও তাদের অজানা ছিল না। তারা এ কিতাব এবং এর উপস্থাপকের দাওয়াতের মধ্যে কোথাও দূরবর্তী এমন কোন স্বার্থপরতার সামান্যতম চিহ্নও দেখতে পেতো না যা থেকে কোন মিথ্যা দাবীদারের কথা ও কাজ কখনো মুক্ত হতে পারে না। নবুওয়াতের দাবী করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের, নিজের পরিবার অথবা নিজের গোত্র ও জাতির জন্য কি অর্জন করতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজের মধ্যে তাঁর নিজের কোন্ স্বার্থটি নিহিত রয়েছে তা তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও চিহ্নিত করতে পারতো না। তারপর এ দাওয়াতের দিকে তাঁর জাতির কেমন ধরনের লোকেরা আকৃষ্ট হয়ে চলছে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের জীবনে কতবড় বিপ্লব সাধিত হচ্ছে তাও তারা দেখছিল। এ সমস্ত বিষয় মিলে মিশে দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই এ পটভূমিতে একথা বলা একদম যথেষ্ট ছিল যে, এ কিতাবের রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হওয়াটা সকল প্রকার সন্দেহ–সংশয়ের উর্ধে। এর পাশে আরো কোন যুক্তি বসিয়ে যুক্তির বহর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

২. ওপরের ভূমিকামূলক বাক্যের পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সম্পর্কে মক্কার মুশরিকরা যে প্রথম আপত্তিটি করতো সেটির পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

৩. এটি নিছক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নয়। বরং এখানে মহাবিস্ময় প্রকাশের ভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয়ের কারণে এ কিতাবের আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হয় সেসব সত্ত্বেও কি এরা প্রকাশ্যে এমন হঠকারিতার কথা বলে যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এটি রচনা করে মিথ্যামিথ্যি একে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন? এমন একটি বাজে ও ভিত্তিহীন দোষারোপ করতে তারা একটুও লজ্জিত হচ্ছে না? যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর কথা ও কাজ সম্পর্কে জানে আর এ কিতাবটিও অনুধাবন করে তারা এ বাজে ও ভিত্তিহীন দোষারোপের কথা শুনে কি অভিমত পোষণ করবে সে সম্পর্কে কোন অনুভূতি কি তাদের নেই?

৪. যেভাবে প্রথম আয়াতে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল এবং কুরআনুল করীমের আল্লাহর কালাম হবার স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় কোন যুক্তি পেশ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। অনুরূপভাবে মক্কার কাফেরদের মিথ্যা অপবাদের জবাবে কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে যে, "এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে।" ওপরে এক নম্বর টীকায় আমরা যে কারণ বর্ণনা করেছি এর কারণও তাই। কে, কোন্ ধরনের পরিবেশে, কিভাবে এ কিতাব পেশ করছিলেন সেসব বিষয় শ্রোতাদের সামনে ছিল এবং এ কিতাবও তার নিজস্ব ভাষাশৈলী, সাহিত্য সম্পদ ও বিষয়বস্তু সহকারে সবার সামনে ছিল। এই সংগে এর প্রভাব ও ফলাফলও মক্কার সমকালীন সমাজে সবাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। এ অবস্থায় এ কিতাবের রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত সত্য হওয়াটা এমন সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনা ছিল যাকে শুধুমাত্র চূড়ান্তভাবে বর্ণনা করে দেয়াই কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ জন্য কোন যুক্তি প্রদান করার প্রচেষ্টা চালানো প্রতিপাদ্য বিষয়কে মজবুত করার পরিবর্তে তাকে আরো দুর্বল করে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটি ঠিক যেমন নাকি দিনের বেলা সূর্য কিরণ দিতে থাকে এবং কোন বেহায়া বেলাজ ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বলে দেয় এখন তো অন্ধকার রাত। এর জবাবে কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট হয় যে, তুমি একে রাত বলছো? এখন তো সামনে রয়েছে আলো ঝলমল দিন। এরপর দিনের উপস্থিতির স্বপক্ষে যদি যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়, তাহলে এর ফলে নিজের জবাবের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে না বরং তার শক্তি কিছুটা কমই করে দেয়া হবে।

৫. অর্থাৎ যেমন এর সত্য হওয়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াটা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বিষয় ঠিক তেমনি এর পেছনে সদুদ্দেশ্য থাকা এবং তোমাদের জন্য এর আল্লাহর রহমত হওয়াটাও সুস্পষ্ট। তোমরা নিজেরাই জানো শত শত বছর থেকে তোমাদের মধ্যে কোন নবী আসেনি। তোমরা নিজেরাই জানো তোমাদের সমগ্র জাতিটাই মূর্খতা, অজ্ঞতা, নৈতিক অধপতন ও মারাত্মক ধরনের পশ্চাদপদতায় ভুগছে। এ মূর্খতার মধ্যে যদি তোমাদেরকে জাগ্রত করার ও সঠিক পথ দেখাবার জন্য তোমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে এতে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? এটা তো

একটি মস্ত বড় প্রয়োজন এবং তোমাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আরবে সত্য দীনের আলো সর্বপ্রথম পৌঁছেছিল হযরত হূদ ও হযরত সালেহ আলাইহিমাস সালামের মাধ্যমে। এটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। তারপর আসেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের যুগের আড়াই হাজার বছর আগে অতিক্রান্ত হয়েছিল তাঁদের যুগ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আরবের যমীনে যে সর্বশেষ নবী পাঠানো হয় তিনি ছিলেন হযরত শো'আইব আলাইহিস সালাম। তার আগমনের পরও প্রায় দু'হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, এ প্রেক্ষিতে এ জাতির মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি একথা বলা একেবারেই যথার্থ ছিল। এ উক্তির অর্থ এ নয় যে, এ জাতির মধ্যে কখনো কোন সতর্ককারী আসেনি। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সুদীর্ঘকাল থেকে এ জাতি একজন সতর্ককারীর প্রত্যাশী ছিল।

এখানে আর একটা প্রশ্ন সামনে এসে যায়। সেটাও পরিষ্কার করে দেয়া দরকার। এ আয়াতটি পড়তে গিয়ে মানুষের মনে সংশয় জাগে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত আরবে যখন কোন নবী আসেননি তখন সে জাহেলী যুগে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিসের ভিত্তিতে? সৎপথ কোন্‌টা এবং অসৎপথ তথা পথভ্রষ্টতা কোন্‌টা তা কি তারা জানতো? তারপর যদি তারা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তাদের এ পথভ্রষ্টতার জন্য তাদেরকে দায়ী করা যেতে পারে কেমন করে? এর জবাব হচ্ছে, সেকালের লোকদের দীনের বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলেও আসল দীন যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবীগণ কখনো মূর্তিপূজা শিখাননি, একথা সেকালেও লোকদের অজানা ছিল না। আরবের লোকেরা তাদের দেশে আবির্ভূত নবীদের যেসব বাণী ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছিল তার মধ্যেও এ সত্য সংরক্ষিত ছিল। নিকটতম দেশগুলোয় আগত নবীগণ যথা হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার মাধ্যমেও তারা এ সত্যের সন্ধান পেয়েছিল। আরবী প্রবাদসমূহের মাধ্যমে একথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজন পরিচিত ছিল যে, প্রাচীন যুগে আরববাসীদের আসল ধর্ম ছিল ইবরাহীমের ধর্ম এবং মূর্তিপূজা সে দেশে শুরু করেছিল আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি। শিরক ও মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও আরবের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে এমন সব লোক ছিল যারা শিরক অস্বীকার করতো, তাওহীদের ঘোষণা দিতো এবং মূর্তির বেদীমূলে বলিদান করার প্রকাশ্যে নিন্দা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের একেবারেই কাছাকাছি সময়ে কুস্‌সা ইবনে সায়েদাতিল ইয়াদী, উমাইয়াহ ইবনে আবিস সাল্‌ত, সুওয়াইদ ইবনে আমরিল মুস্‌তালেকী, ওকী ইবনে সালামাহ ইবনে যুহাইরিল ইয়াদী, আমর ইবনে জুন্‌দুবিল জুহানী, আবু কায়েস সার্‌মাহ ইবনে আবী আনাস, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, ওয়ারাকাহ ইবনে নওফাল, উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আমের ইবনুয্ যরবিল আদওয়ানী, আল্লাফ ইবনে শিহাবিত তামিমী, আলমুতালামমিস ইবনে উমাইয়াহ আলকিনানী, যুহাইর ইবনে আবী সুলমা, খালেদ ইবনে সিনান ইবনে গাইসিল আব্‌সী, আবদুল্লাহ আলকুদ্বাঈ এবং এ ধরনের আরো বহু লোকের

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④

আল্লাহই[৬] আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৭] তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তাঁর সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা সচেতন হবে না?[৮]

অবস্থা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। ইতিহাসে এঁদেরকে 'হুনাফা' তথা সঠিক সত্যপন্থী নামে স্মরণ করা হয়। এঁরা সবাই প্রকাশ্যে তাওহীদকে আসল দীন বলে ঘোষণা করতেন এবং মুশরিকদের ধর্মের সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতেন। একথা সুস্পষ্ট, পূর্ববর্তী নবীগণের যেসব শিক্ষা সমাজে তখনো প্রচলিত ছিল তার প্রভাব থেকেই তাদের মনে এ চিন্তার জন্ম হয়েছিল। তাছাড়া ইয়ামনে খৃষ্টীয় চতুর্থ–পঞ্চম শতকের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের যে শিলালিপি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সেকালে সেখানে একটি তাওহীদী ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। তার অনুসারীদের আকাশ ও পৃথিবীর করুণাময় রবকেই একক ইলাহ ও উপাস্য স্বীকার করতো। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে একটি প্রাচীন উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে। তাতে লিখিত আছে, এ উপাসনালয়টি "যু–সামাওয়া"র "ইলাহ" অর্থাৎ আকাশের ইলাহি অথবা আকাশের রবের ইবাদাত করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে লিখিত হয়েছে :

بنصر وردا الهن بعل سمين وارضين (بنصرو بعون الا له رب السماء ولارض)

এ কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে তাওহীদ বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করছে। একটি কবরগাত্রে সে যুগের আর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে :

بخيل رحمنن (يعنى استعين بحول الرحمن)

অনুরূপভাবে দক্ষিণ আরবে ফোরাত নদী ও কিন্নাসিরীনের মাঝখানে যাবাদ নামক স্থানে ৫১২ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে লিখিত আছে :

بسم الا له ، لا عز الا له ، لا شكر الا له

এ সমস্ত কথাই প্রকাশ করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষার প্রভাব আরব ভূখণ্ড থেকে একেবারে

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۞ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে তাঁর কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।[৯] তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন,[১০] মহাপরাক্রমশালী[১১] ও করুণাময়[১২] তিনি।

নির্মূল হয়ে যায়নি। কমপক্ষে "তোমাদের আল্লাহ এক ও একক" একথাটুকু স্মরণ করিয়ে দেবার মতো বহু উপায় ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ৮৪ টীকা)

৬. এবার মুশরিকদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব দেয়া হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের ব্যাপারে তারা এ আপত্তিটি করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেবতা ও মনীষীদের উপাস্য হওয়ার কথা অস্বীকার করেন এবং জোরেশোরে এ দাওয়াত দেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ, কর্ম সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, দুর্দশা নিরসনকারী ও স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন শাসক নেই, এ ব্যাপারে তারা কঠোর আপত্তি জানাতো।

৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৫৪ আয়াত; ইউনুস, ৩ আয়াত এবং আর রা'য়াদ ২ আয়াত।

৮. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টাইতো আসল খোদা। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা কতই উদ্ভট, বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্যে তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে কর্ম-সম্পাদনকারী মনে করে বসেছো। এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে মহান আল্লাহই এসবের স্রষ্টা। তাঁর সত্তা ছাড়া বাকি এখানে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। মহান আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করার পর কোথাও গিয়ে ঘুমিয়েও পড়েননি। বরং তিনিই নিজের এ রাজ্যের সিংহাসনে আসীন এবং শাসনকর্তা হয়েছেন। অথচ তোমাদের বুদ্ধি এতই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে যে, তোমরা সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে কয়েকটি সত্তাকে নিজেদের ভাগ্যের মালিক গণ্য করে বসেছো। যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করতে না পারেন তাহলে তাদের মধ্য থেকে কার তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা আছে? যদি আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার শক্তি রাখে? যদি আল্লাহ সুপারিশ না শোনেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কে তাঁর কাছ থেকে এ সুপারিশ গ্রহণ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে?

৯. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যেটা এক হাজার বছরের ইতিহাস আল্লাহর কাছে যেন সেটা মাত্র একদিনের কাজ। আল্লাহর ইচ্ছা পূরণকারীদের হাতে আজ এর পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং কালই তারা এ বিবরণ তাঁর কাছে পেশ করে যাতে তাদেরকে আবার পরদিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসেবে এক হাজার বছর) কাজ দেয়া হয় এ প্রসংগটি কুরআনের আরো দু' জায়গায় এসেছে। সেগুলোও সামনে রাখলে এর অর্থ ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। আরবের কাফেররা বলতো ঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের দাবী নিয়ে সামনে এসেছেন আজ কয়েক বছর হয়ে গেলো। তিনি বারবার আমাদের বলছেন, যদি আমার এ দাওয়াত তোমরা গ্রহণ না করো এবং আমাকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। কয়েক বছর থেকে তিনি নিজের এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করে চলছেন কিন্তু আজো আযাব আসেনি। অথচ আমরা একবার নয় হাজার বার তাঁকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। তাঁর এ হুমকি যদি যথার্থই সত্য হতো তাহলে এতদিন কবে না জানি আমাদের ওপর আযাব এসে যেতো। এর জবাবে আল্লাহ সূরা হাজ্জে বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۗ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

"এরা শীঘ্রই আযাব চাচ্ছে। আল্লাহ কখনো ওয়াদার বরখেলাফ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছে এক দিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে।" (৪৭ আয়াত)

অন্য এক জায়গায় একথার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۙ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۗ

"প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে সেই আযাব সম্পর্কে, যা কাফেরদের ওপর আপতিত হবে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সমুচ্চ স্তরসম্পন্ন (অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কাজ করেন)। ফেরেশ্‌তা ও রূহ তাঁর দিকে উঠতে থাকে এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। কাজেই হে নবী! সুন্দর সবর অবলম্বন করুন। এরা তাকে দূরবর্তী মনে করে এবং আমি তাকে দেখছি নিকটে।

(আল মা'আরিজ, ১–৭ আয়াত)

এসব উক্তি থেকে যে কথা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা দুনিয়ার সময় ও পঞ্জিকা অনুসারে হয় না কোন জাতিকে যদি বলা হয়, অমুক নীতি অবলম্বন করলে তোমাদের এ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে,

যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তমরূপেই সৃষ্টি করেছেন।[১৩] তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো।[১৪] তারপর তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন[১৫] এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন,[১৬] আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন,[১৭] তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১৮]

তাহলে যে জাতি একথার এ অর্থ গ্রহণ করবে যে, আজই সে নীতি অবলম্বন করলে কালই তার অশুভ পরিণাম সামনে এসে যাবে, সে হবে বড়ই নির্বোধ। পরিণামফল প্রকাশের জন্য দিন, মাস, বছর তো কোন্ ছার শতাব্দীও তেমন কোন দীর্ঘ কাল নয়।

১০. অন্য যেই হোক না কেন তার কাছে একটি জিনিস প্রকাশিত থাকলে অন্য অসংখ্য জিনিস রয়েছে অপ্রকাশিত। ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী অথবা আল্লাহর নির্বাচিত পছন্দনীয় বান্দাগণ যেই হোন না কেন তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সবকিছু জানেন। একমাত্র আল্লাহ এ গুণের অধিকারী, তাঁর কাছে সবকিছুই দিনের আলোকের মতই উজ্জ্বল। যা কিছু হয়ে গেছে, যা কিছু বর্তমান, যা কিছু হবে সবই তার কাছে সমান আলোকোজ্জ্বল।

১১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রাধান্যের অধিকারী। বিশ্ব–জাহানে এমন কোন শক্তি নেই যা তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর অধীন এবং তাঁর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই।

১২. অর্থাৎ এ প্রাধান্য, পরাক্রম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি সত্ত্বেও তিনি জালেম নন। বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও করুণাময়।

১৩. এ মহাবিশ্বে তিনি অসংখ্য ও অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কোন একটি জিনিসও অসুন্দর, সৌষ্ঠবহীন ও বেখাপ্পা নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের নিজস্ব একটি আলাদা সৌন্দর্য আছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় সুসামঞ্জস্য ও উপযোগী। যে কাজের জন্য যে জিনিসই তিনি তৈরি করেছেন সবচেয়ে উপযোগী আকৃতিতে সর্বাধিক কার্যকর গুণাবলী সহকারে তৈরি করেছেন। দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কানের যে আকৃতি তিনি দিয়েছেন এর চেয়ে ভালো ও উপযোগী কোন আকৃতির কল্পনাও এ জন্য করা যেতে পারে না। হাওয়া ও পানি যেসব উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তাদের জন্য হাওয়া ঠিক তেমনি যেমন হওয়া উচিত এবং পানি ঠিক তেমনি

গুণাবলী সম্পন্ন যেমন তার হওয়া উচিত। আল্লাহর তৈরি করা কোন জিনিসের নক্‌শার মধ্যে কোন রকমের খুঁত বা ত্রুটি চিহ্নিত করা সম্ভবই নয় এবং তার মধ্যে কোন প্রকার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব দেয়াও অসম্ভব।

১৪. অর্থাৎ প্রথমে তিনি নিজের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্মের (Direct Creation) মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেই মানুষের মধ্যেই বংশ বিস্তারের এমন শক্তি সৃষ্টি করে দেন যার ফলে তার শুক্র থেকে তারই মতো মানুষের জন্ম হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভূমির সারবস্তু একত্র করে একটি সৃষ্টি–নির্দেশের মাধ্যমে তার মধ্যে এমন জীবন, চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করে দেন যার সাহায্যে মানুষের মতো একটি আশ্চর্য সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে, এটি ছিল একটি কর্মকুশলতা। আবার দ্বিতীয় কর্মকুশলতা হচ্ছে, আগামীতে আরো মানুষ তৈরি করার জন্য এমন একটি অদ্ভুত যন্ত্র মানুষের নিজের কাঠামোতেই রেখে দেন যার গঠন প্রকৃতি ও কার্যধারা দেখে মানবীয় বিবেক–বুদ্ধি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াত থেকে প্রথম মানুষের প্রত্যক্ষ সৃষ্টির কথা সুস্পষ্ট হয় এটি তার অন্যতম। ডারউইনের যুগ থেকে বিজ্ঞানীগণ এ চিন্তাধারার ব্যাপারে নাসিকা কুঞ্চন করে আসছেন এবং একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ গণ্য করে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষের ও জীবের সমস্ত প্রজাতির না হোক অন্ততপক্ষে সর্বপ্রথম জীবন কোষের সরাসরি সৃষ্টি থেকে তো তাঁরা নিজেদের চিন্তাকে কোনক্রমেই মুক্ত করতে পারবেন না। এ সৃষ্টিকে মেনে না নেয়া হলে এ ধরনের একদম বাজে কথা মেনে নিতে হবে যে, জীবনের সূচনা হয় নিছক একটি দুর্ঘটনাক্রমে। অথচ শুধুমাত্র এক কোষসম্পন্ন (Cell) জীবের মধ্যে জীবনের সবচেয়ে সহজ অবস্থাও এতটা জটিল ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারুকাজে পরিপূর্ণ, যাকে একটি দুর্ঘটনার ফল গণ্য করা একেবারেই অযৌক্তিক। এটা ক্রমবিবর্তন মতবাদের প্রবক্তারা সৃষ্টি মতবাদকে যতটা অবৈজ্ঞানিক গণ্য করেন তার চেয়ে লাখো গুণ বেশী অবৈজ্ঞানিক। আর মানুষ যদি একবার একথা মেনে নেয় যে, জীবনের প্রথম কোষটি সরাসরি সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করেছিল, তাহলে এরপর আর একথা মেনে নিতে দোষ কি যে, জীবের প্রত্যেক প্রজাতির প্রথমজন স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করে এবং তারপর তার বংশধারা প্রজনন প্রক্রিয়ার (Procreation) বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে চলে আসছে। একথা মেনে নেবার ফলে এমন অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ডারউইনবাদের পতাকাবাহীদের সকল বৈজ্ঞানিক কাব্য চর্চা সত্ত্বেও তাদের ক্রমবিবর্তন মতবাদে যেগুলোর কোন সমাধান হয়নি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩৫; আন নিসা, ১; আল আন'আম, ৬৩; আল আ'রাফ, ১০ ও ১৪৫; আল হিজর, ১৭; আল হাজ্জ, ৫; এবং আল মু'মিনূন, ১২–১৩ টীকা)

১৫. অর্থাৎ একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব থেকে বাড়িয়ে তাকে পূর্ণ মানবিক আকৃতিতে পৌঁছান এবং সমস্ত অংগ–প্রত্যংগ ও পঞ্চেন্দ্রিয় সহকারে তাকে পুরোপুরি শারীরিক আকৃতি দান করেন।

১৬. রূহ বলতে নিছক যে জীবন প্রবাহের বদৌলতে একটি জীবের দেহ যন্ত্র সচল ও সক্রিয় হয় তাকে বুঝানো হয়নি। বরং এমন বিশেষ সার সত্তা ও সার উপাদান বুঝানো হয়েছে যা চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয়

এবং যার বদৌলতে মানুষ পৃথিবীর অন্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, অহংবোধের অধিকারী এবং প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তায় পরিণত হয়। এ রূহকে মহান আল্লাহ নিজের রূহ্ এ অর্থে বলেছেন যে, তা তাঁরই মালিকানাধীন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে তাকে সম্পর্কিত করণ ঠিক তেমনি ধরনের যেমন একটি জিনিস তার মালিকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার জিনিস হিসেবে আখ্যায়িত হয়। অথবা এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, ইচ্ছা, সংকল্প, সিদ্ধান্ত, ইখতিয়ার এবং এ ধরনের আরো যেসব গুণাবলীর উদ্ভব হয়েছে এসবই মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। বস্তুর কোন যৌগিক উপাদান এদের উৎস নয় বরং এদের উৎস হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান থেকে সে জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে সে লাভ করেছে জ্ঞানবত্তা ও বিচক্ষণতা। আল্লাহর ক্ষমতা থেকে সে লাভ করেছে স্বাধীন ক্ষমতা। এসব গুণাবলী মানুষের মধ্যে কোন অজ্ঞান, নির্বোধ ও অক্ষম উৎস থেকে আসেনি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, ১৭ ও ১৯ টীকা)

১৭. এটি একটি সূক্ষ্ম বর্ণনাভংগী। রূহ সঞ্চার করার আগে মানুষের সমস্ত আলোচনা প্রথম পুরুষে করা হয় ঃ "তাকে সৃষ্টি করেছেন," "তার বংশ উৎপাদন করেছেন," "তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন", "তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন" এর কারণ হচ্ছে তখন পর্যন্ত সে সম্বোধন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেনি। তারপর প্রাণ সঞ্চার করার পর এখন তাকে বলা হচ্ছে, "তোমাকে কান দিয়েছেন", "চোখ দিয়েছেন," "হৃদয় দিয়েছেন" কারণ প্রাণের অধিকারী হয়ে যাবার পরই সে এখন এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যার ফলে তাকে সম্বোধন করা যেতে পারে।

কান ও চোখ অর্থ হচ্ছে এমন সব মাধ্যম যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। যদিও জ্ঞান আহরণের মাধ্যমের মধ্যে জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকও অন্তরভুক্ত তবুও যেহেতু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর তুলনায় অনেক বেশী বড় ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই কুরআন বিভিন্ন স্থানে এ দু'টিকেই আল্লাহর উল্লেখযোগ্য দান আকারে পেশ করছে। এরপর "হৃদয়" মানে হচ্ছে এমন একটি "মন" (Mind) যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত ও তথ্যাদি বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে আনে এবং কর্মের বিভিন্ন সম্ভাব্য পথগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি পথ নির্বাচন করে এবং সে পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮. অর্থাৎ এ মহান মর্যাদাসম্পন্ন মানবিক রূহ এত উন্নত পর্যায়ের গুণাবলী সহকারে তোমাকে তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তুমি দুনিয়ায় পশুদের মতো অবস্থান করবে এবং পশুরা নিজেদের জীবনের যে চিত্র তৈরি করতে পারে তুমি তোমার জীবনের জন্য তেমনি ধরনের একটি চিত্র তৈরি করে নেবে। এ চোখ দু'টি তোমাকে দেয়া হয়েছিল অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য, অন্ধ হয়ে থাকার জন্য দেয়া হয়নি। এ কান দু'টি তোমাকে দেয়া হয়েছিল পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য, বধির হয়ে বসে থাকার জন্য নয়। এ হৃদয় তোমাকে দেয়া হয়েছিল সত্যকে বুঝার এবং সঠিক চিন্তা ও কাজ করার জন্য। এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমার সমস্ত যোগ্যতা কেবলমাত্র নিজের পাশবিক প্রবৃত্তি লালনের উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করবে এবং এর চাইতে যদি কিছুটা ওপরে ওঠো তাহলে নিজের স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দর্শন ও কর্মসূচী তৈরি করতে লেগে যাবে। আল্লাহর কাছ থেকে এ মহামূল্যবান নিয়ামত লাভ করার পর যখন তুমি নাস্তিক্যবাদ বা শিরকের পথ অবলম্বন

আর[১৯] এরা বলে, "যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" আসল কথা হচ্ছে, এরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।[২০] এদেরকে বলে দাও, "মৃত্যুর যে ফেরেশ্‌তাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্‌জায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।[২১]

করো, যখন তুমি নিজেই খোদা বা অন্য খোদাদের বান্দা হয়ে বসো, যখন তুমি প্রবৃত্তির দাস হয়ে দেহ ও কামনার ভোগ–লালসায় ডুবে যেতে থাকো তখন যেন নিজের খোদাকে একথা বলো যে, আমি এসব নিয়ামতের যোগ্য ছিলাম না, আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি না করে একটি বানর, নেকড়ে, কুমীর বা কাক হিসেবে সৃষ্টি করা উচিত ছিল।

১৯. রিসালাত ও তাওহীদ সম্পর্কে কাফেরদের আপত্তির জবাব দেবার পর এবার ইসলামের তৃতীয় মৌলিক আকীদা অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে তাদের আপত্তি উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। আয়াতে وَقَالُوا শব্দের প্রথমে যে "ওয়াও" হরফটি বসানো হয়েছে সেটি আসলে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এ প্যারাগ্রাফটির সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ শব্দ বিন্যাস যেন এভাবে করা হয়েছে ঃ "তারা বলে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল নয়", "তারা বলে আল্লাহ একক উপাস্য নয়" এবং "তারা বলে আমরা মারা যাবার পর আবার আমাদের উত্থান হবে না।"

২০. ওপরের বাক্য এবং এ বাক্যের মধ্যে পুরোপুরি একটি কাহিনী অব্যক্ত রয়ে গেছে। শ্রোতার চিন্তার ওপর এটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম বাক্যে কাফেরদের যে আপত্তির কথা বলা হয়েছে তা এতই বাজে ও উদ্ভট যে, তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। শুধুমাত্র তার উল্লেখ করাই তার উদ্ভট হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ তাদের আপত্তি যে দু'টি অংশ নিয়ে সে দু'টিই আদতে অযৌক্তিক। তাদের একথা বলা, "আমরা মাটিতে মিশে যাবো" এর কি অর্থ হতে পারে? "আমরা" যে জিনিসটির নাম সেটি আবার কবে মাটিতে মিশে যায়? মাটিতে তো কেবল সেই দেহ মিশে যায় যার ভেতর থেকে "আমরা" বের হয়ে গেছে। দেহের নাম "আমরা" নয়। জীবন্ত অবস্থায় যখন সেই দেহের অংশগুলো কেটে ফেলা হয় তখন অংগের পর অংগ কেটে ফেলা হয় কিন্তু "আমরা" পুরোপুরি নিজের জায়গায় থেকে যায়। তার কোন একটি অংশও কর্তিত কোন অংগের সাথে চলে যায় না। আর যখন "আমরা" দেহ থেকে বের

হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ দেহটি বর্তমান থাকলেও তার ওপর এই "আমরা" এর কোন সামান্যতম অংশও প্রযোজ্য হয় না। তাইতো একজন প্রাণ উৎসর্গকারী প্রেমিক নিজের প্রেমাস্পদের মৃতদেহটি নিয়ে কবরস্থ করে। কারণ প্রেমাস্পদ সে দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। এখন আর সে প্রেমাস্পদ নয়। বরং যে দেহের মধ্যে এক সময় প্রেমাস্পদ থাকতো সেই শূন্য দেহ পিঞ্জরটিকে সে দাফন করে। কাজেই আপত্তি উত্থাপনকারীদের আপত্তির প্রথম কথাই ভিত্তিহীন। এখন থাকে এর দ্বিতীয় অংশ। অর্থাৎ "আমাদের কি আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" এ ধরনের অস্বীকার ও বিস্ময়সূচক প্রশ্ন আদতে সৃষ্টিই হতো না যদি আপত্তিকারীরা কথা বলার আগে এই "আমরা" এবং এ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটার তাৎপর্য নিয়ে একটু খানি চিন্তা-ভাবনা করতো। এই "আমরা" এর বর্তমান জন্মের উৎস এ ছাড়া আর কি যে, কোথাও থেকে কয়লা, কোথাও থেকে লোহা, কোথাও থেকে চুন এবং এ ধরনের অন্যান্য উপকরণ একত্র হয়ে গেছে আর এরপর তাদের মৃত্তিকার দেহ পিঞ্জরে এ "আমরা" বিরাজিত হয়েছে। তারপর তাদের মৃত্যুর পর কি ঘটে? তাদের মৃত্তিকার দেহপিঞ্জর থেকে যখন "আমরা" বের হয়ে যায় তখন তাদের আবাস নির্মাণ করার জন্য মাটির বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের শরীরের যেসব অংশ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা সবই সেই মাটিতে ফিরে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমে যে এই "আমরা"কে এ আবাস তৈরি করে দিয়েছিলেন, তিনি কি পুনরবার সেই একই উপকরণের সাহায্যে সেই একই আবাস তৈরি করে নতুন করে তাদেরকে তার মধ্যে রাখতে পারেন না? এ জিনিস যখন প্রথমে সম্ভব ছিল এবং ঘটনার আকারে সংঘটিত হয়েও গেছে তখন দ্বিতীয়বার এর সম্ভব হবার এবং ঘটনার রূপ পরিগ্রহ করার পথে বাধা কোথায়? সামান্য বুদ্ধি ব্যবহার করলে মানুষ নিজেই এগুলো বুঝতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে না কেন? কি কারণে সে জেনে বুঝে মৃত্যু পরের জীবন ও পরকাল সম্পর্কে এ ধরনের অযথা আপত্তি তুলছেন? মাঝখানের সমস্ত আলোচনা বাদ দিয়ে মহান আল্লাহ দ্বিতীয় বাক্যে এ প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন এভাবে : "আসলে এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাতকার অস্বীকার করে।" অর্থাৎ আসল কথা এ নয় যে, পুনরবার সৃষ্টি কোন অভিন্ন ও অসম্ভব কথা, ফলে একথা তারা বুঝতে পারছে না। বরং তাদের একথা বুঝার পথে যে জিনিসটি বাধা দিচ্ছে তা হচ্ছে তাদের এ ইচ্ছা যে, তারা পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছা মতো পাপকাজ করবে এবং তারপর কোন প্রকার দণ্ড লাভ না করেই(Scl-Frcc) এখান থেকে বের হয়ে যাবে, তারপর তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কোন জবাবদিহি তাদের করতে হবে না।

২১. অর্থাৎ তোমাদের সেই "আমরা" মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে না বরং তার কর্মসময় শেষ হতেই আল্লাহর মউতের ফেরেশ্‌তা আসবে এবং তাকে দেহ থেকে বের করে পুরোপুরি নিজের কব্‌জায় নিয়ে নেবে। তার কোন সামান্যতম অংশও দেহের সাথে থেকে গিয়ে মাটিতে মিশে যাবে না। তাকে সম্পূর্ণত এবং একেবারে অবিকৃত ও অটুট অবস্থায় তত্ত্বাবধানে (Custody) নিয়ে নেয়া হবে এবং তার রবের সামনে পেশ করা হবে।

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে অনেকগুলো সত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলোকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ⑫ وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ⑬ فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑭

২ রুকূ’

হায়,[২২] যদি তুমি দেখতে সে সময় যখন এ অপরাধীরা মাথা নিচু করে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (তখন তারা বলতে থাকবে) "হে আমাদের রব। আমরা ভালোভাবেই দেখে নিয়েছি ও শুনেছি, এখন আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করবো, এবার আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।" (জবাবে বলা হবে) "যদি আমি চাইতাম তাহলে পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দিয়ে দিতাম।[২৩] কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো।[২৪] কাজেই আজকের দিনের এ সাক্ষাতকারের কথা ভুলে গিয়ে তোমরা যে কাজ করেছো এখন তার মজা ভোগ কর।[২৫] আমিও এখন তোমাদের ভুলে গিয়েছি, নিজেদের কর্মফল হিসেবে চিরন্তন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো।"

এক ঃ এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যু এমনভাবে আসে না যেমন নাকি একটি ঘড়ি চলতে চলতে হঠাৎ দম শেষ হয়ে যাবার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বরং এ কাজের জন্য আসলে আল্লাহ একজন বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি এসে যথারীতি রূহকে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করেন যেমন একজন সরকারী আমীন (Official Receiver) কোন জিনিস নিজের কব্‌জায় নিয়ে নেয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে এর আরো যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়, মৃত্যু বিভাগীয় এ অফিসারের অধীনে পুরোপুরি একটি আমলা বাহিনী রয়েছে। তারা মৃত্যু দান করা, রূহকে দেহ থেকে বের করে আনা এবং তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবার বহুতর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ আমলারা অপরাধী রূহ ও সৎ মু’মিন রূহদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন। (এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা নিসা, ৯৭; আন’আম, ৯৩; আন নাহ্‌ল, ২৮; এবং ওয়াকি’আহ ৮৩ ও ৯৪ আয়াত দেখুন)

দুই ঃ এ থেকে একথাও জানা যায় যে, মৃত্যুর ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং তার রূহ দেহ থেকে বের হয়ে সঞ্জীবিত থাকে। কুরআনের "মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্‌জায় নিয়ে নেবে" শব্দগুলো এ সত্যটির প্রকাশ করে। কারণ কোন বিলুপ্ত জিনিসকে কব্‌জায় নেয়া বা নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় না। কব্‌জায় বা অধিকারে নিয়ে নেবার অর্থই হচ্ছে অধিকৃত জিনিস অধিকারকারীর কাছে রয়েছে।

তিন ঃ এ থেকে এও জানা যায় যে, মৃত্যুকালে যে জিনিসটি অধিকারে নিয়ে নেয়া হয় তা মানুষের জৈবিক জীবন (Biological life) নয় বরং তার সেই অহম (Ego) যাকে "আমরা" ও "তুমি" "তোমরা" শব্দাবলীর সাহায্যে চিত্রিত করা হয়। এ অহম দুনিয়ার কাজ করে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় তার সবটুকুই পুরোপুরি (Intact) বের করে নেয়া হয়। এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যার ফলে তার গুণাবলীতে কোনপ্রকার কমবেশী দেখা দেয় না। মৃত্যুর পরে এ জিনিসই তার রবের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একেই পরকালে নবজন্ম ও নতুন দেহ দান করা হবে। এরি বিরুদ্ধে 'মোকদ্দমা' চালানো হবে। এর কাছ থেকেই হিসেব নেয়া হবে এবং একেই পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

২২. এবার মানুষের এ "অহম" যখন তার রবের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের হিসেব দেবার জন্য তাঁর সামনে দাঁড়াবে তখনকার অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ এভাবে সত্যের সাথে সাক্ষাত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি লোকদেরকে পথ দেখানো আমার লক্ষ হতো তাহলে দুনিয়ার জীবনে এত বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এখানে আনার কি দরকার ছিল? এ ধরনের পথের দিশা তো আমি তোমাদেরকে আগেও দিতে পারতাম। কিন্তু শুরু থেকেই তো তোমাদের জন্য আমার এ পরিকল্পনা ছিল না। আমি তো প্রকৃত সত্যকে দৃষ্টির অন্তরালে এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুভবের বাইরে রেখে তোমাদের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছিলাম। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, তোমরা সরাসরি তাকে আবরণমুক্ত দেখার পরিবর্তে বিশ্ব-জাহানে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের মধ্যে তার আলামতগুলো দেখে নিজের বুদ্ধির সাহায্যে তাকে চিনতে পারো কিনা, আমি নিজের নবীদের ও কিতাবসমূহের সাহায্যে এ সত্যকে চিনে নেবার ব্যাপারে তোমাদের যে সাহায্য করতে চাচ্ছি তা থেকে তোমরা ফায়দা হাসিল করছো কি না এবং সত্যকে জেনে নেবার পর নিজের প্রবৃত্তিকে এতটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারো কিনা যার ফলে কামনা ও বাসনার দাসত্ব মুক্ত হয়ে তোমরা এ সত্যকে মেনে নেবে এবং এ অনুযায়ী নিজের জীবন ধারার সংস্কার সাধন করবে। এ পরীক্ষায় তোমরা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছো। এখন পুনর্বার এ পরীক্ষার সিলসিলা শুরু করায় লাভ কি? দ্বিতীয় পরীক্ষাটি যদি এমনভাবে নেয়া হয় যে, তোমরা এখানে যা কিছু শুনেছো ও দেখেছো তা যদি সব মনেই থেকে যায়, তাহলে আদতে সেটা কোন পরীক্ষাই হবে না। আর যদি আগের মতো সকল চিন্তা-ভাবনা মুক্ত করে এবং সত্যকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে তোমাদের আবার দুনিয়ায় সৃষ্টি করা যায় এবং প্রথম বারে যেমন নেয়া হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে একেবারে নতুন করে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তাহলে বিগত পরীক্ষার তুলনায় ফলাফল কিছুই ভিন্নতর হবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ২২৮; আল আন'আম, ৬ ও ১৪১; ইউনুস, ২৬ এবং আল মু'মিনূন, ৯১ টীকা)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।[২৬] তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাংখা সহকারে[২৭] এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[২৮]

২৪. মহান আল্লাহ আদম সৃষ্টির সময় ইবলিসকে সম্বোধন করে যে উক্তি করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা সাদের শেষ রুকূ'তে সে সময়ের পুরো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইবলিস আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকার করে এবং আদমের বংশধরদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের অবকাশ চায়। জবাবে আল্লাহ বলেন,

فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

"কাজেই এ হচ্ছে সত্য এবং আমি সত্যই বলি যে, আমি জাহান্নাম ভরে দেবো তোমার এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা।"

أَجْمَعِينَ শব্দটি এখানে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি যে, সকল জিন ও সমস্ত মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শয়তানরা এবং শয়তানদের অনুসারী মানুষরা সবাই এক সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২৫. অর্থাৎ একদিন যে নিজের রবের সামনে যেতে হবে একথা দুনিয়ায় আয়েশ–আরামে মত্ত হয়ে একদম ভুলে গেছো।

২৬. অন্য কথায় তারা নিজেদের বিভ্রান্ত চিন্তা পরিহার করে আল্লাহর কথা মেনে নেয়া এবং আল্লাহর বন্দেগী অবলম্বন করে তাঁর ইবাদাত করাকে নিজেদের জন্য সম্মানহানিকর মনে করে না। আত্মম্ভরিতা তাদেরকে সত্যগ্রহণ ও রবের আনুগত্য করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

২৭. অর্থাৎ আয়েশ–আরাম করে রাত কাটাবার পরিবর্তে তারা নিজেদের রবের ইবাদাত করে। তাদের অবস্থা এমনসব দুনিয়াপূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ–গান, শরাব পান ও খেলা তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

তারপর কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের চোখের শীতলতার কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[২৯] এটা কি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মু'মিন সে ফাসেকের মতো হয়ে যাবে?[৩০] এ দু'পক্ষ সমান হতে পারে না।[৩১] যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান[৩২] আপ্যায়নের জন্য তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ।

দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সমর্পণ করে।

বিছানা থেকে পিঠ আলাদা রাখার মানে এ নয় যে, তারা রাতে শয়ন করে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা রাতের একটি অংশ কাটায় আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য দিয়ে।

২৮. রিযিক বলতে বুঝায় হালাল রিযিক। হারাম ধন-সম্পদকে আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করেন না। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যা সামান্য কিছু পবিত্র রিযিক আমি দিয়েছি তা থেকেই খরচ করে। তার সীমা অতিক্রম করে নিজের খরচপাতি পুরা করার জন্য হারাম সম্পদে হাত দেয় না।

২৯. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এই হাদীসে কুদসীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر

"আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।"

এ বিষয়বস্তুটিই সামান্য শাব্দিক হেরফের করে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রা) এবং হযরত সাহল ইবনে সা'আদ সায়েদী নবী করীম (সা)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝٢٠ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٢١ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۚ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۝٢٢

আর যারা ফাসেকীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তার মধ্যেই ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন করো এখন সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোন না কোন) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকবো, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে।[৩৩] *আর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?*[৩৪] *এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবোই।*

থেকে রেওয়ায়াত করেছেন এবং মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর ও তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে তা উদ্ধৃত করেছেন।

৩০. এখানে মু'মিন ও ফাসেকের দু'টি বিপরীতমুখী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মু'মিন বলতে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহকে নিজের রব ও একমাত্র উপাস্য মেনে নিয়ে আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে যে আইন-কানুন পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে ফাসেক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ফাসেকী আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসা বা অন্যকথায় বিদ্রোহ, বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে।

৩১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের চিন্তাধারা ও জীবন যাপন পদ্ধতি এক হতে পারে না এবং আখেরাতেও তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ এক হওয়া সম্ভব নয়।

৩২. অর্থাৎ সেই জান্নাতগুলো নিছক তাদের প্রমোদ উদ্যান হবে না বরং সেখানেই হবে তাদের আবাস। চিরকাল তারা সেখানে বসবাস করবে।

৩৩. "বড় শাস্তি" বলতে আখেরাতের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। কুফরী ও ফাসেকীর অপরাধে এ শাস্তি দেয়া হবে। এর মোকাবিলায় "ছোট শাস্তি" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর অর্থ হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষ যেসব কষ্ট পায় সেগুলো। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন রোগ, নিজের প্রিয়তম লোকদের মৃত্যু, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ক্ষতি, ব্যর্থতা ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাংগা, যুদ্ধ এবং আরো বহু আপদ-বিপদ, যা লাখো লাখো কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করে। এসব বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ও কল্যাণকর দিক বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এর ফলে বড় শাস্তি ভোগ করার আগেই যেন মানুষ সচেতন হয়ে যায় এবং এমন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ত্যাগ করে যার পরিণামে তাদেরকে এ বড় শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্যকথায় এর অর্থ হবে, দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষকে একেবারেই পরমানন্দে রাখেননি। নিশ্চিন্তে ও আরামে জীবনের গাড়ি চলতে থাকলে মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, তার চেয়ে বড় আর কোন শক্তি নেই যে, তার কোন ক্ষতি করতে পারে। বরং আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যার ফলে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ওপর এমন সব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে একদিকে নিজেদের অসহায়তা এবং অন্যদিকে নিজেদের চেয়ে বড় ও উর্ধে একটি মহাপরাক্রমশালী সর্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার অনুভূতি দান করে। এ বিপদ প্রত্যেকটি ব্যক্তি, দল ও জাতিকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের ভাগ্য ওপরে অন্য একজন নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবকিছু তোমাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি। আসল ক্ষমতা রয়েছে তাঁর হাতে যিনি কর্তৃত্ব সহকারে এসব কিছু করে চলছেন। তাঁর পক্ষ থেকে যখনই কোন বিপদ তোমাদের ওপর আসে, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ তোমরা গড়ে তুলতে পারো না এবং কোন জিন, রূহ, দেব-দেবী, নবী বা অলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেও তার পথ রোধ করতে সক্ষম হও না।

এদিক দিয়ে বিচার করলে এ বিপদ নিছক বিপদ নয় বরং আল্লাহর সতর্ক সংকেত। মানুষকে সত্য জানাবার এবং তার বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একে পাঠানো হয়। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি মানুষ দুনিয়াতেই নিজের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয় তাহলে আখেরাতে আল্লাহর বড় শাস্তির মুখোমুখি হবার তার কোন প্রয়োজনই দেখা দেবে না।

৩৪. "রবের আয়াত" অর্থাৎ তাঁর নিদর্শনাবলী, এ শব্দগুলো বড়ই ব্যাপক অর্থবোধক। সব ধরনের নিদর্শন এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। কুরআন মজীদের সমস্ত বর্ণনা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে জানা যায়, এ নিদর্শনাবলী নিম্নোক্ত ছয় প্রকারের ঃ

এক ঃ যে নিদর্শনাবলী পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের এবং বিশ্ব-জাহানের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

দুই ঃ যে নিদর্শনগুলো মানুষের নিজের জন্ম এবং তার গঠনাকৃতি ও অস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়।

তিন ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিতে, তার অচেতন ও অবচেতন মনে এবং তার নৈতিক চিন্তাধারায় পাওয়া যায়।

চার ঃ যে নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায়।

পাঁচ ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের প্রতি অবতীর্ণ পার্থিব আপদ-বিপদ ও আসমানী বালা-মুসিবতের মধ্যে পাওয়া যায়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, কাজেই সেই জিনিসই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।[৩৫] এ কিতাবকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম।[৩৬] আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দেই যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো।[৩৭] নিশ্চিতই তোমার রবই কিয়ামতের দিন সেসব কথার ফায়সালা করে দেবেন যেগুলোর ব্যাপারে তারা (বনী ইসরাঈল) পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত থেকেছে।[৩৮]

ছয় ঃ আর এসবের পরে আল্লাহ তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যেসব আয়াত পাঠান ওপরে বর্ণিত নিদর্শনগুলো যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করেছে এ আয়াতগুলোর সাহায্যে যুক্তি–সংগত পদ্ধতিতে মানুষকে সেসব সত্যের জ্ঞান দান করাই কাম্য।

এ সমস্ত নিদর্শন পূর্ণ একাত্মতা সহকারে সোচ্চার কন্ঠে মানুষকে একথা বলে যাচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ নও এবং বহু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা নও বরং তোমার আল্লাহ মাত্র একজন। তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তোমাকে এ জগতে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন করে পাঠানো হয়নি। বরং নিজের জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করার পর তোমাকে তোমার আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে এবং নিজের কাজের প্রেক্ষিতে পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে। কাজেই তোমার আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য নিজের নবী ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে পথ–নির্দেশনা পাঠিয়েছেন তা মেনে চলো এবং স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকো। এখন একথা সুস্পষ্ট, যে মানুষকে এত বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছে, যাকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য এমন অগণিত নিদর্শনাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং যাকে দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান এবং চিন্তা করার জন্য অন্তরের নিয়ামত দান করা হয়েছে, সে যদি সমস্ত নিদর্শনাবলীর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়, যারা বুঝাচ্ছে তাদের কথা ও উপদেশের জন্যও নিজের কানের ছিদ্র বন্ধ করে নেয় এবং নিজের মন–মস্তিষ্ক দিয়েও উল্টা দর্শনই তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। এরপর সে দুনিয়ায় নিজের পরীক্ষার

মেয়াদ খতম করার পর যখন তার আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তখন বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি লাভ করার যোগ্যই হবে।

৩৫. আপাতত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে বক্তব্যের লক্ষ হচ্ছে তারা, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল। সূরার শুরুতে (২ ও ৩ আয়াতে) যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে এখান থেকে সেদিকেই বক্তব্যের মোড় ফিরে যাচ্ছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব আসেনি, তিনি নিজেই সেটি রচনা করেছেন এবং এখন দাবী করছেন এটি আল্লাহ নাযিল করেছেন। এর একটি জবাব প্রথম দিকের আয়াতে দেয়া হয়েছিল, এখন দ্বিতীয় জবাব দেয়া হচ্ছে। এ প্রসংগে যে প্রথম কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে নবী! এই মূর্খ লোকেরা তোমার প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়া অসম্ভব মনে করছে এবং তারা চাচ্ছে প্রতি দু'জনে একজন এটি অস্বীকার না করলেও অন্তত যেন এ ব্যাপারে সন্দেহেই লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এক বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হওয়াতো মানুষের ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নয়। এর আগে বহু নবীর প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে মূসা (আলাইহিস সালাম)–কে প্রদত্ত কিতাবটি ছিল সবচেয়ে খ্যাতিমান। কাজেই একই ধরনের আর একটি জিনিস আজ তোমাদের দেয়া হয়েছে। তাহলে অযথা এর মধ্যে সন্দেহ করার মতো এমন নতুন কি তোমরা দেখলে?

৩৬. অর্থাৎ সে কিতাবটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ লাভের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছিল এবং এ কিতাবটিকে ঠিক তেমনি তোমাদের পথনির্দেশ লাভের জন্য পাঠানো হয়েছে। আগেই তিন আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ উক্তির পূর্ণ তাৎপর্য এর ঐতিহাসিক পটভূমি দৃষ্টিসমক্ষে রাখার পরই অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত এবং মক্কার কাফেরদের কাছেও একথা অজানা ছিল না যে, বনী ইসরাঈল কয়েকশো বছর থেকে মিসরে চরম লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবন যাপন করে আসছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাদের মধ্যে মূসার (আলাইহিস সালাম) জন্ম দেন। তাঁর মাধ্যমে এ জাতিকে দাসত্বমুক্ত করেন। তারপর তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেন এবং তার বদৌলতে সেই অনুন্নত ও নিষ্পেষিত জাতি পথের দিশা লাভ করে দুনিয়ার বুকে একটি খ্যাতিমান জাতিতে পরিণত হয়। এ ইতিহাসের দিকে ইংগিত করে আরববাসীদেরকে বলা হচ্ছে যেভাবে বনী ইসরাঈলকে পথের দিশা দান করার জন্য সেই কিতাব পাঠানো হয়েছিল ঠিক তোমাদেরকে পথের দিশা দান করার জন্য এ কিতাব পাঠানো হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ এ কিতাব বনী ইসরাঈলকে যে শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত করে এবং তাদেরকে উন্নতির যে উচ্চ শিখরে পৌছিয়ে দেয় তা নিছক তাদের মধ্যে কিতাব এসে যাওয়ার ফল ছিল না। এ কিতাব কোন তাবীজ বা মাদুলী ধরনের কিছু ছিল না যে, এ জাতির গলায় ঝুলিয়ে দেবার সাথে সাথেই তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকে। বরং আল্লাহর আয়াতের প্রতি তারা যে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করে এবং আল্লাহর বিধান

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

আর এরা কি (এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে) কোন পথনির্দেশ পায়নি যে, এদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে আজ এরা চলাফেরা করছে?[৩৯] এর মধ্যে রয়েছে বিরাট নিদর্শনাবলী, এরা কি শুনবে না? আর এরা কি কখনো এ দৃশ্য দেখেনি যে, আমি উষর ভূমির ওপর পানির ধারা প্রবাহিত করি এবং তারপর এমন জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করি যেখান থেকে তাদের পশুরাও খাদ্য লাভ করে এবং তারা নিজেরাও খায়? তবুও কি এরা কিছুই দেখে না?[৪০] এরা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে বলো এ ফায়সালা কবে হবে?"[৪১] এদেরকে বলে দাও, "যারা কুফরী করেছে ফায়সালার দিন ঈমান আনা তাদের জন্য মোটেই লাভজনক হবে না এবং এরপর এদের কোন অবকাশ দেয়া হবে না।"[৪২] বেশ, এদেরকে এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষায় আছে।

মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, এ সমস্ত অলৌকিকতা ছিল তারই ফল। স্বয়ং বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত ছিল এবং যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার ও স্বাদ আস্বাদনে সীমা ছাড়িয়ে যেত না। সত্যপ্রিয়তার খাতিরে তারা যখন দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকটি বিপদের মোকাবিলা করে, প্রত্যেকটি ক্ষতি ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা থেকে নিয়ে বহিরাগত দীনের শত্রুদের পর্যন্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখনই তারা দুনিয়ায় নেতৃত্বের আসনে বসে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহর কিতাবের অবতরণ যেমন বনী ইসরাঈলের ভাগ্যের ফায়সালা করেছিল তেমনিভাবে এ কিতাবের অবতরণও আজ তোমাদের ভাগ্যের ফায়সালা করে দেবে। এখন তারাই নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবে

যারা একে মেনে নিয়ে ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সত্যের অনুসরণ করে চলবে। যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

৩৮. এখানে ইংগিত করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের সর্বব্যাপী কোন্দল ও দলাদলির প্রতি। এসব কোন্দলে তারা লিপ্ত হয়েছিল ঈমান ও প্রত্যয়ের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার, নিজেদের সত্যপন্থী নেতাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করার ও বৈষয়িক স্বার্থপূজারী হয়ে যাবার পর। এ অবস্থার একটি ফল তো সুস্পষ্ট। বনী ইসরাঈল কোন্ ধরনের লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হয়েছিল, তা সারা দুনিয়া দেখছে। দ্বিতীয় ফলটি এখন দুনিয়াবাসীরা জানে না এবং তা কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে।

৩৯. যে জাতির মধ্যেই নবী এসেছে তার ভাগ্যের ফায়সালা সেই নবীর ব্যাপারে সে যে নীতি ও দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতেই হয়ে গেছে। রসূলকে প্রত্যাখ্যান করার পর আর কোন জাতি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে একমাত্র তারাই টিকে গেছে। প্রত্যাখ্যান কারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ করে চিরকালের জন্য শিক্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। ইতিহাসের এ ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা কি কোন শিক্ষা লাভ করেনি?

৪০. পূর্বাপর আলোচনা সামনে রাখলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এখানে মৃত্যুপরের জীবনের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য এ প্রসংগ উত্থাপন করা হয়নি যেমন কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণভাবে করা হয়েছে বরং এ প্রসংগে অন্য একটি উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে। আসলে এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, একটি অনুর্বর পতিত জমি দেখে যেমন কেউ ধারণা করতে পারে না যে, এটিও কোনদিন সবুজ–শ্যামল ক্ষেতে পরিণত হবে। কিন্তু আল্লাহর পাঠানো এক পশলা বৃষ্টিধারাই এর কায়া পাল্টে দেয়। ঠিক তেমনি ইসলামের দাওয়াতও তোমাদের চোখে বর্তমানে একটি অচল জিনিস বলে প্রতিভাত হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর কুদরাতের একটি ঝলকানি তাকে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবে যে, তোমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

৪১. অর্থাৎ তোমরা যে বলছো, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং আমাদেরকে যারা মিথ্যুক বলছে তাদের ওপর আল্লাহর গযব পড়বে, এ সময়টা কখন আসবে? কবে আমাদের ও তোমাদের ফায়সালা হয়ে যাবে?

৪২. অর্থাৎ এটা এমন কি জিনিস যে জন্য তোমরা অস্থির হয়ে পড়েছো? আল্লাহর আযাব একবার এসে গেলে তখন তো আর তোমরা সংযত হবার সুযোগ পাবে না। আযাব আসার আগে তোমরা যে অবকাশটা পাচ্ছো এটাকে দুর্লভ সুযোগ মনে করো। আযাবকে সরাসরি সামনে দেখার পর ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না।